the ULAB ian

A STUDENT MOUTHPIECE

Contains exclusive Bangla and English content...

সেপ্টেম্বর ২০১২

ময়ূর ও টিয়া, কামরুল হাসান

সম্পাদকীয় ০২
বাংলাদেশ ও শিশুশ্রম

ইউল্যাব বারতা

দেশের গণ্ডি পেরিয়ে আন্তর্জাতিক পরিসরে ইউল্যাব ক্রিকেট দল ০৩
সম্ভাবনার নতুন দ্বার উন্মোচনে মাস্টার্স অব সোস্যাল সায়েন্স বিভাগ
শিক্ষিত চোর ০৪
এক চামচ আনন্দে একটু একটু চুমুক

অপরূপ কথা ০৫

কিংবদন্তী ০৬
পটুয়া কামরুল হাসান
বাস্তবতা ও স্বপ্নের মেলবন্ধন ০৭
হুমায়ূননামা

চরিতগাথা ০৮
বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ
আশার ছলনে ভুলি... ০৯
নারীকে নারী হিসেবে নয়
মূল্য দিতে হবে মানুষ হিসেবে

দৃশ্যরূপ ১০
মুভি রিভিউ: মেড ইন বাংলাদেশ
গর্ব নিয়ে দেশ গড়ার কথা বলে
বুক রিভিউ: ঝরা পাতার গল্প

খেলাধুলা ১১
টিম ইউল্যাব

শেষের পাতা ১২
কথোপকথন
ঘরে বাইরে ঘুরোঘুরি

সম্পাদকীয়

সেপ্টেম্বর ২০১২

প্রধান পৃষ্ঠপোষক উপদেষ্টা
ডঃ জুড উইলিয়াম হেনিলো

উপদেষ্টা সম্পাদক
রেজওয়ান শরীফ

সম্পাদক
সাউদিয়া আফরিন
গণমাধ্যম ও সাংবাদিকতা বিভাগ

উপ-সম্পাদক
মদিনা জাহান রিমি
গণমাধ্যম ও সাংবাদিকতা বিভাগ

ইউল্যাবিয়ান দল
ঈশিতা শারমিন রায়হান
গণমাধ্যম ও সাংবাদিকতা বিভাগ
অনন্ত ইউসুফ
গণমাধ্যম ও সাংবাদিকতা বিভাগ
ফারজানা সুলতানা
গণমাধ্যম ও সাংবাদিকতা বিভাগ
ফজলে রাব্বি খান
গণমাধ্যম ও সাংবাদিকতা বিভাগ
মরিয়াম আক্তার নীলা
গণমাধ্যম ও সাংবাদিকতা বিভাগ
কানিজ ফাতেমা
গণমাধ্যম ও সাংবাদিকতা বিভাগ
আবদুল্লাহ্ আল্-রাফি সরোজ
গণমাধ্যম ও সাংবাদিকতা বিভাগ
সিওল আহমেদ
গণমাধ্যম ও সাংবাদিকতা বিভাগ
ফারহান হাবীব
গণমাধ্যম ও সাংবাদিকতা বিভাগ
অমৃতা হাসান
স্কুল অব বিজনেস স্টাডিজ

নকশা ও অলংকরণ
অপটিমিজম কম্যুনিকেশন

রেখাচিত্র
কামরুল হাসান
আর্ট অব বাংলাদেশ সিরিজ ৩, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী

কৃতজ্ঞতা স্বীকার
বিকাশ চন্দ্র ভৌমিক

পত্রিকাটি পাঠকের মতামতকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়।
আপনার মতামত পাঠাতে পারেন এই ইমেল ঠিকানায়:
theulabian@ulab.edu.bd

বাংলাদেশ ও শিশুশ্রম

আধুনিক সভ্যতা দাবী করে আজকের বিশ্ব দাসপ্রথা পেছনে ফেলে এগিয়েছে বহুদূর। আসলেই কি দাসপ্রথাকে আমরা বিদায় জানাতে পেরেছি? সমগ্র বিশ্বে যখন লক্ষ লক্ষ শিশু বিভিন্ন ধরনের শারীরিক শ্রমের সাথে যুক্ত, সেই বিশ্বে মাথা উঁচু করে দাড়িয়ে আমরা কি বলতে পারি পৃথিবীর মানচিত্র থেকে দাসপ্রথা মুছে গেছে!

তথাকথিত দাসপ্রথা হয়তো আজ আর নেই, কিন্তু রয়ে গেছে শিশুশ্রমের মত ঘৃণ্য প্রথা। আর্ন্তজাতিক শিশু তহবিল (ইউনিসেফ) এর সংজ্ঞা অনুযায়ী শিশু শ্রম বলতে ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত সপ্তাহে ৪৩ ঘণ্টার বেশি কাজ করা বোঝায়। ফলে তারা শুধু শারীরিক নয় মানসিকভাবেও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। পাশাপাশি বঞ্চিত হচ্ছে শিক্ষা, স্বাস্থ্যসহ অনান্য মৌলিক অধিকার থেকে।

সারা পৃথিবী যখন শিশুশ্রম প্রতিরোধে সোচ্চার তখন বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট সম্পূর্ণ বিপরীত । এর জন্য দায়ী কে? সমাজ ব্যবস্থা? নাকি জাতীয় অর্থনীতির করুন দশা? যা প্রতিনিয়ত হাজার হাজার শিশুকে ঠেলে দিচ্ছে এক অন্ধকারাচ্ছন্ন ভবিষ্যতের দিকে।

যে শিশুটির বয়স স্কুলে যাওয়ার, মাঠে খেলার; সেই শিশু কচি হাতে কাঁধে তুলে নেয় পরিবারের বোঝা, তারপর ধীরে ধীরে বিবর্ণ হতে শুরু করে জীবনের সুন্দর মুহূর্তগুলো। বর্তমানে দেশে প্রায় ৭৯ লাখ শিশু কায়িক শ্রমের সাথে জড়িত। অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি গত চার বছরে শিশু শ্রমিকের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১০ লাখ এ। এই সংখ্যা দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে। অবশ্য যে দেশের ৩১ দশমিক ৬ ভাগ মানুষের বসবাস দারিদ্রসীমার নিচে, সেদেশে শিশুশ্রমের এমন চিত্র মোটেও অস্বাভাবিক কিছু নয়।

আর্ন্তজাতিক শিশু তহবিল (ইউনিসেফ) এবং আর্ন্তজাতিক শ্রমসংস্থার (আইএলওর) এক হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশে কৃষি থেকে শুরু করে জাহাজভাঙা শিল্পসহ মোট চারশ'র বেশি পেশায় শিশুশ্রম ব্যবহৃত হচ্ছে । গ্রামাঞ্চলে শিশুশ্রমের প্রবণতা শহরের তুলনায় অনেক বেশি। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) এবং আইএলও পরিচালিত সর্বশেষ জাতীয় শিশুশ্রম জরিপ ২০০২-০৩ অনুযায়ী, ১৪ বছর বয়সি শিশুদের দৈহিক শ্রম নিষিদ্ধ হলেও দেশে প্রায় ৭৪ লাখ শিশু ভারী কাজের সাথে জড়িত। এদের মধ্যে ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত প্রায় ১৩ লাখ শিশু সপ্তাহে ১শ ৬৮ ঘণ্টার মধ্যে কাজ করছে প্রায় ৯০ ঘণ্টা।

একজন শিশু কত বছর বয়স পর্যন্ত শিশু হিসেবে গণ্য হবে তা নিয়েও রয়েছে যথেস্ট জটিলতা। এই বয়স নির্ধারণের জন্য নেই কোন সুনির্দিষ্ট আইন। আর্ন্তজাতিক শ্রম সংস্থা'র(আইএলও) শিশু আইনের বিভিন্ন ধারায় কাজের ধরনের ক্ষেত্রে শিশুর বয়স নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে অথচ আমাদের দেশে মানা হচ্ছে না শিশুশ্রম সংশ্লিষ্ট আইন।

অন্যদিকে বাংলাদেশে শিশু আইন ১৯৭৪ অনুসারে ১৬ বছর বয়স পর্যন্ত একজনকে শিশু হিসেবে ধরা হয়েছে। আবার জাতীয় শিশু নীতি ২০১১ অনুযায়ী ১৮ বছরের কম বয়সী কাউকে শিশু হিসেবে চিত্রিত করার বিধান আছে। তবে এখানেও রয়েছে জটিলতা। চুয়াত্তরের শিশু আইন এবং জাতীয় শিশু নীতি ২০১১ এর নির্ধারিত বয়সের সাংর্ঘষিক অবস্থান কোন সমাধান আনতে পারেনি বরং একটি জাতীয় বিষয়কে রাহুগ্রস্থ করে রেখেছে আজ পর্যন্ত।

শিশুশ্রম বন্ধ করতে এবছর প্রথমবারের মতো বাংলাদেশে শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবসে শিশুশ্রমের ওপর নির্মিত প্রামাণ্যচিত্র উপর একটি উৎসবের আয়োজন করেছিল।

তবে সবচেয়ে বড় নৈতিক সিদ্ধান্তের বিষয় হল বাংলাদেশের আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে হুট করেই শিশুশ্রম বন্ধের আর্ন্তজাতিক চাপ পর্যালোচনা। বাংলাদেশসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কর্মরত মানবাধিকার এবং শিশু সংগঠনগুলো শিশুশ্রম বন্ধে সুস্পষ্ট আইন ও উদ্যোগ নিলেও নেয়নি শিশু শ্রমিক পুর্নবাসন বিষয়ে কোন ব্যবস্থা। অর্থনৈতিক দৈন্য দশা যেখানে শিশুশ্রমের মূল কারণ সেই মূলকে সমূলে উৎপাটন ব্যতিত অথবা সঠিক পুর্নবাসনের ব্যবস্থা না করে শিশুশ্রম বন্ধ বাড়িয়ে দিতে পারে ঘরহীন ভাসমান মানুষের সংখ্যা।

অর্থনৈতিক উন্নয়ন ছাড়া যে শিশুশ্রম বন্ধ সম্ভব নয় তার প্রমাণ মেলে বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ পড়লেই। শিক্ষানীতি অনুযায়ী অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা বাধ্যতামুলক ও বিনামুল্য করা হয়েছে। শিক্ষা গ্রহণের এত বড় সুযোগ পেয়েও নিজের আর পরিবারের জীবন ধারণের জন্য লেখাপড়ার পরিবর্তে অনেক শিশু যোগ দিচ্ছে নানান পেশায়। ফলসরূপ ১০ লাখেরও বেশী শিশু কখনও স্কুলে যাওয়ার সুযোগ পায়নি। দু'বেলা দু'মুঠো অন্নের জন্য তারা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে প্রতিনিয়ত কাজ করে চলেছে।

যদি সত্যিকার অর্থে এই অবস্থার পরিবর্তন করতে হয় তবে পরিবর্তন আনতে হবে এসব শিশুর আর্থসামাজিক অবস্থার। সেই সাথে নিশ্চিত করা প্রয়োজন সামাজিক নিরাপত্তা এবং সঠিক পুর্নবাসন নতুবা শিশুশ্রম বন্ধের অর্ন্তনিহিত উদ্দেশ্য কখনই অর্জিত হবে না।

সাউদিয়া আফরিন

দেশের গণ্ডি পেরিয়ে আন্তর্জাতিক পরিসরে

ইউল্যাব ক্রিকেট দল

ছবি: ইউল্যাব

আন্ত-বিশ্ববিদ্যালয় টুর্নামেন্ট ফেয়ার প্লে- কাপ এ দু'বারের চ্যাম্পিয়ন ইউল্যাব ক্রিকেট দল এবার আন্তর্জাতিক পরিসরে আন্ত-বিশ্ববিদ্যালয় টুর্নামেন্ট খেলার অভিজ্ঞতা অর্জন করল। মালয়েশিয়ায় অনুষ্ঠিত পঞ্চম আন্তর্জাতিক আন্ত-বিশ্ববিদ্যালয় টুর্নামেন্টে অংশগ্রহন করেছিল ৭ টি দেশের ৮ টি বিশ্ববিদ্যালয়। দলগুলো হল মালয়েশিয়ার ইউনিভার্সিটি অব কেবাংসান ও ইউনিভার্সিটি টেকনলজি মারা ,ইন্ডিয়ার কৃষ্ট ইউনিভার্সিটি, শ্রীলঙ্কার কলম্বো ইউনিভার্সিটি, পাকিস্তানের ফাস্ট ইসলামাবাদ, থাইল্যান্ডের সিয়াম ইউনিভার্সিটি, সিঙ্গাপুরের ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি এবং বাংলাদেশ থেকে ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস বাংলাদেশ।

টুর্নামেন্টটি জুন মাসের ৪ থেকে ১০ তারিখের মধ্যে অনুষ্ঠিত হলেও ইউল্যাব ক্রিকেট দল ফেব্রুয়ারী মাসেই আমন্ত্রন পায়। বাংলাদেশ জাতীয় দলের একসময়ের সহকারি কোচ সালাউদ্দিন , যিনি বর্তমানে ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব মালয়েশিয়া'র ক্রিকেট দলের প্রধান হিসেবে আছেন, তার মাধ্যমেই এই টুর্নামেন্টের আমন্ত্রণ পায় ইউল্যাব। ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি মালয়েশিয়া'র ডেপুটি ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর আই,আর, ডঃ ওথম্যান এ করিম, আমন্ত্রণটি পাঠান ফেব্রুয়ারী মাসের ৩ তারিখ। সেটি ছিল এই বছরের ফেয়ার প্লে-কাপ টুর্নামেন্টের আগে, তাই বলা যায় এটি ফেয়ার প্লে কাপ-এ সাফল্য অর্জনে বাড়তি প্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে। এ প্রসঙ্গে ইউল্যাব ক্রিকেট দলের অধিনায়ক আসিফ পাঠান সাজ্জাদ বলেন, 'আসলে মালয়েশিয়ার এই টুর্নামেন্টটি খেলার আমন্ত্রণ পাওয়ার পর থেকে আমাদের ভিতরে একটা আত্মবিশ্বাস কাজ করতে থাকে, যে আমরা যদি ফেয়ার প্লে- কাপ চ্যাম্পিয়ন হই তবে মালয়েশিয়া ট্যুরেও সাহসিকতার সাথে খেলতে পারবো। এবং আমরা তা পেরেছি।'

সাফল্য পেয়েছে ইউল্যাব ক্রিকেট দল। হয়তো চ্যাম্পিয়ন বা রানার আপ হতে পারেনি, কিন্তু জাতীয় সীমানা পেরিয়ে আন্তর্জাতিক পরিসরে ৭ টি দেশের ৮ টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে দ্বিতীয় রানার আপ হওয়াটাও খুব ছোট অর্জন নয়। যেখানে চ্যাম্পিয়ন ও রানার আপ দলসহ অন্যান্য দলেও রয়েছে অভিজ্ঞ খেলোয়াড় সেখানে দ্বিতীয় রানার আপ হওয়াটা সাফল্যই বটে। ইউল্যাব ক্রিকেট দলের উপদেষ্টা তাহসান খান বলেন, 'আমার ভয় ছিল, আমরা যেখানে খেলতে যাচ্ছি সেটা আইসিসি'র প্লে-গ্রাউন্ড, তাছাড়া যারা খেলায় অংশগ্রহন করেছেন তাদের অনেকেই অভিজ্ঞ ছিলেন। যেমন মালয়েশিয়ান একটি দল যেটি পরে চ্যাম্পিয়ন হয় সে দলের ৬ জন খেলোয়ার তাদের জাতীয় দলের হয়ে খেলেন আবার শ্রীলঙ্কান দলটি যেটি পরে রানার আপ হয় তারা মুলতঃ সেকেন্ডারি ডিভিশনে খেলেন। তাই সব মিলিয়ে একটি ভয় কাজ করছিল আমাদের ইউল্যাব ক্রিকেট দল কতটুকু ভাল খেলতে পারবে তা নিয়ে। কিন্তু আমরা হতাশ হইনি, একদিকে আমাদের ক্রিকেটাররা যেমন ভাল প্রস্তুতি নিয়েছিল ঠিক তেমনি খেলেছেও সাফল্যের সাথে।

৫টি ম্যাচের মধ্যে ৩ টিতে জয় ও ২টিতে হার ছিল ইউল্যাব ক্রিকেট দলের। শ্রীলঙ্কার কলম্বো ইউনিভার্সিটি এবং মালয়েশিয়া'র ইউনিভার্সিটি অব কেবাংসান মালয়েশিয়া'র কাছে হেরেছে ইউল্যাব। অন্যদিকে জয় মিলে পাকিস্তানের ফাস্ট ইসলামাবাদ , ইন্ডিয়ার কৃষ্ট ইউনিভার্সিটি এবং মালয়শিয়ার সায়েন্স এন্ড টেকনোলোজি এর সাথে । মালয়শিয়ান ইউনিভার্সিটি'র বিপরীতে ৭৬ ও ইন্ডিয়ান ইউনিভার্সিটির বিপরীতে ১০০ রান করে ম্যান অব দ্যা ম্যাচ হন ইউল্যাব ক্রিকেট দলের আইজাল আহমেদ। এর মধ্যে সেঞ্চুরি করা ম্যাচটি ছিল তৃতীয় স্থান নির্ধারণী ম্যাচ এবং সেই ম্যাচে তিনি খেলেছেন অপরাজিত ইনিংস। আইজাল তার অনুভূতি ব্যক্ত করলেন এভাবে, 'বাংলাদেশের বিভিন্ন ম্যাচে ম্যান অব দ্যা ম্যাচ হওয়ার অভিজ্ঞতা আছে, তবে আন্তর্জাতিক পরিসরে কোনও ম্যাচ খেলে ম্যান অব দ্যা ম্যাচ হওয়ার অভিজ্ঞতাটা একেবারে ভিন্ন। নিজেকে পেশাদার খেলোয়াড় বলে মনে হয়েছে । এই দুটি ম্যান অব দ্যা ম্যাচ ছাড়া ইউল্যাব ক্রিকেট দল দ্বিতীয় রানার আপ হিসেবে অর্জন করেছে ৭৫০ ডলার।

মালয়েশিয়ার ট্যুর শেষ। বাংলাদেশে এসে ইউল্যাব ক্রিকেট দলের সদস্যরা একে একে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন পড়াশোনায়। তবে তারা বসে নেই, ধীরে ধীরে প্রস্তুতি নিচ্ছে নতুন কোনও টুর্নামেন্টে অংশ নেয়ার। আর সামনের বছর ফেয়ার প্লে-কাপ তো আছেই।

▶ ফজলে রাব্বি খান

সম্ভাবনার নতুন দ্বার উন্মোচনে

মাস্টার্স অব সোস্যাল সায়েন্স বিভাগ

২রা জুন ২০১২, 'লিডারশীপ ইন চ্যালেঞ্জিং টাইমস' শ্লোগান কে সঙ্গে নিয়ে যাত্রা শুরু করেছে ইউনির্ভাসিটি অব লিবারেল আর্টস বাংলাদেশের মিডিয়া স্টাডিজ এন্ড র্জানালিজম (ইউল্যাব) এর মাস্টার্স অব সোস্যাল সায়েন্স বিভাগ। গুলশানের হোটেল ওয়াশিংটনে দিনব্যাপী এই আয়োজন উদ্বোধন করেন ইউল্যাব এর উপাচার্য অধ্যাপক ইমরান রহমান।

তিনি তাঁর উদ্বোধনী বক্তবে বলেন ইউল্যাব এর মূল লক্ষ্য 'সময় উপযুক্ত দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি', তিনি আরও যোগ করেন বর্তমান সময়ে প্রতিটি ক্ষেত্রে সফলতা লাভের জন্য প্রয়োজন নতুন প্রযুক্তিনির্ভর যোগাযোগ। বাংলাদেশে প্রতিনিয়ত সম্প্রসারিত হচ্ছে গণমাধ্যম, সেই সাথে চাহিদা বাড়ছে দক্ষ জনশক্তির। অধ্যাপক ইমরান রহমান বিশ্বাস করেন গণমাধ্যমের এই ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে ইউল্যাবের উদ্যোগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

এম,এস,জে বিভাগের প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান, অস্ট্রেলিয়ার এডিথ কওয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, ব্রায়ান সুস্মিথ অতিথি বক্তা হিসেবে তার অভিজ্ঞতা বিনিময় করেন। বাংলাদেশে প্রথম ভ্রমণের সময় থেকে আজ পর্যন্ত দেশের যে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন তিনি দেখেছেন সেই সব ছবি উঠে এসেছে তাঁর বক্তব্যে। তাঁর কথার একটা বড় অংশ জুড়ে ছিল ইউল্যাবের বেড়ে ওঠা এবং সেই সাথে কিভাবে এম,এস,জে বিভাগ মাত্র ২০ জন ছাত্র নিয়ে যাত্রা শুরু করে আজ পরিণত হয়েছে জ্ঞানবৃক্ষে। এছাড়াও তিনি যোগ করেন বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান মিডিয়া শিল্পে আসন্ন টেলিভিশন চ্যানেল, এফ এম রেডিও, এবং সংবাদপত্রের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ইউল্যাবের মাস্টারস প্রোগ্রাম আরও সৃষ্টিশীল এবং পেশাদারিত তৈরিতে সহায়ক হবে।

অন্যান্য অথিতিদের মাঝে ছিলেন আমেরিকান চেম্বার অব কমার্স এর প্রেসিডেন্ট, আফতাব উল আলম। তিনি বলেন, 'বিশ্বজুড়ে ব্যবসা ও শিল্পক্ষেত্রে যোগাযোগ এবং নেতৃত্ব দক্ষতা অন্যান্য দেশকে সফলতার দিকে ধাবিত করছে।' ভারবাল ও ননভারবাল কমিউনিকেশনের পার্থক্য এবং প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে তিনি বলেন 'একজন মানুষের অন্য যেকোনও দেশে ভ্রমনের পূর্বে সেই দেশের ননভারবাল কমিউনিকেশন সম্পর্কে জানা উচিত,' তিনি আরও যোগ করেন, 'যোগাযোগ জ্ঞান ছাড়াই যেমন একজন নেতাকে যোগ্য নেতা হিসেবে বিবেচনা করা যায় না, ঠিক একইভাবে সারা বিশ্বে গ্রহণযোগ্যতা অর্জনে প্রয়োজন কমিউনিকেশন সম্পর্কে নিবিড় জ্ঞান।' যোগাযোগ সফল এবং কার্যকর করার লক্ষ্যে বিভিন্ন দেশের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানার উপর জোর দেন তিনি।

অনুষ্ঠানে সর্বশেষ বক্তা ছিলেন এম,এস,জে বিভাগের বর্তমান বিভাগীয় প্রধান জুড উলিইয়াম হেনিলো। তিনি বাংলাদেশের শিক্ষাক্ষেত্রে গণমাধ্যম ও সাংবাদিকতা বিভাগের প্রাচীন ও বর্তমান পরিস্থিতি তুলে ধরেন। ইতিহাস বর্ণনার পাশাপাশি কোন কোন ক্ষেত্রে ইউল্যাব এর এম এস জে বিভাগ দৃষ্টান্তমূলক পদক্ষেপ নিয়েছে সেই উদাহরণ তুলে ধরেন। এম,এস,জে মাস্টারস এর কিছু উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য যেমন ছাত্ররা কিভাবে থ্রি এইচ (হার্ট, হ্যান্ড ও হেড) ব্যবহার করে তাদের অভিজ্ঞতাকে শিক্ষায় রূপান্তরিত করতে শিখবে তাও তুলে ধরেন তিনি। তাঁর সুনিপুণ বক্তব্য দিয়ে শেষ হয়, 'লিডারশীপ ইন চ্যালেঞ্জিং টাইমস' ২০১২।

▶ ঈশিতা শারমিন রায়হান

ইউল্যাব বারতা
সেপ্টেম্বর ২০১২

অনুসন্ধানী প্রতিবেদন

শিক্ষিত চোর

> একজন শিক্ষকের ডেস্ক থেকে একটি এক্সট্রার্নাল হার্ডড্রাইভ চুরি, চৌর্যবৃত্তি প্রতিরোধে সবার মনোযোগ আর্কষণ করে। কিন্তু পুরস্কার ঘোষনা করা হলেও তা আর খুজে পাওয়া যায়নি।

ঠিক সিনেমার মত মানুষের চোখ ও প্রযুক্তি উভয়ই যেন হার মেনেছে এক চোরের তীক্ষ্ণ বুদ্ধির কাছে। প্রযুক্তিকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে চুরির একের পর এক ঘটনা ঘটছে ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস বাংলাদেশ (ইউল্যাব)-এ। এতো এতো প্রহরী আর সিসি ক্যামেরা যেন ফারাও খুফোদের সেই বুড়ো প্রহরী, যার ঘুমকে কাজে লাগিয়ে বেদুইন ডাকাত হাজার বছর ধরে লুটপাট চালিয়েছে পিরামিডে।

কিছুদিন আগে এমনই এক চাঞ্চল্যকর চুরি হয়ে গেল এর ধানমান্ডি ৭/এ তে অবস্থিত ইউল্যাব এর দ্বিতীয় ক্যাম্পাসের লবিতে। চুরির ঘটনাটি ছিল কিছুটা এরকম– ক্যাম্পাসের অভ্যর্থনা ডেস্কে বসেন রিসিপসনিস্ট হুমায়রা, ঘটনার দিন প্রশাসনিক কাজে হুমায়রা কিছু সময়ের জন্য নিজের ডেস্ক ছেড়ে গেলে সুযোগটি কাজে লাগায় ইউল্যাবের শিক্ষিত এক চোর। এ বিষয়ে হুমায়রা ইউল্যাবিয়ানকে বলেন 'আমার ব্যাগে পাঁচ হাজার টাকা, মোবাইল ফোন ও কিছু প্রয়োজনীয় জিনিস ছিল। যে আমার টাকা আর ফোন চুরি করেছে তাকে আমি চিনি এবং তার সাথে খুব ভালো সম্পর্ক ছিল। সে এই সুসম্পর্কটাকেই কাজে লাগিয়েছে।'

চোর যে বেশ চালাক এবং এই কাজে পটু, তার প্রমান মেলে চুরি পরবর্তী দুটি উল্লেখযোগ্য কাজের মাধ্যমে। প্রথমত, শিক্ষিত চোর ক্যাম্পাস থেকে বের হওয়ার সময় ব্যবহার করেছে অন্যের পরিচয় পত্র এবং চুরির কিছু সময় পরই ক্যাম্পাসে এসেছে সম্পুর্ণ অন্য পোষাকে।

চুরি হওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যে সিসি ক্যামেরায় নিবিড় অনুসন্ধান করা হলেও চোরকে সনাক্ত করা সম্ভব হয়নি। কারণ সিসি ক্যামেরায় দোষীর মুখ অস্পট দেখাচ্ছিল। অবাক করার মত তথ্য হল, এর আগেও শুধুমাত্র ক্যামেরায় মুখচ্ছবির অস্পষ্টতার জন্যই ধরা সম্ভব হয়নি বেশ ক'জন অপরাধীকে। আর গত বছর একজন শিক্ষকের ডেস্ক থেকে একটি এক্সট্রার্নাল হার্ডড্রাইভ চুরি, চৌর্যবৃত্তি প্রতিরোধে সবার মনোযোগ আর্কষণ করে। কিন্তু পুরস্কার ঘোষনা করা হলেও তা আর পরবর্তীতে খুঁজে পাওয়া যায়নি। এভাবেই শির্ক্ষাথীদের মানিব্যাগ, মোবাইল ফোন চুরি হওয়া, এখন সবার কাছে অতি পরিচিত ঘটনা। প্রিয় বন্ধুদের সাথে আড্ডা দেওয়ার সময় হঠ্যৎ মোবাইল খুজে না পাওয়া শিক্ষার্থীর সংখ্যাও কম নয়। অথচ প্রতিবার জয়ী হয়েছে সভ্য চোরেরা। এরকম ঘটনার স্বীকার শুধুমাত্র শিক্ষার্থীরা নয়, এই শিক্ষিত চোরের হাত থেকে রক্ষা পায়নি প্রশাসনিক কর্মচারী ও শিক্ষকরাও। তাই সবশেষে বলতে চাই 'দুর্জন বিদ্যান হইলেও পরিত্যাজ্য', অর্থাৎ প্রিয় ইউল্যাবিয়ান, যদি জেনে থাকেন আপনারই কোন বন্ধু এধরনের কাজের সাথে জড়িত। তবে তাকে সহযোগিতা না করে বরং ইউল্যাবকে সাহায্য করুন। এতে উপকৃত হবে আপনারই সহপাঠী বন্ধুরা।

সাউদিয়া আফরিন

বৈশাখী উৎসব ১৪১৯

এক চামচ আনন্দে একটু একটু চুমুক!

মদিনা জাহান রিমি

মিডিয়া স্টাডিজ এন্ড জার্নালিজম (এমএসজে) ডিপার্টমেন্ট এর ছাত্রী প্রেমা ধর তার গাওয়া লালন গীতি 'ধন্য ধন্য বলি তারে' গানটি শেষ করার পর পরই তাকে জিজ্ঞেস করলাম ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস আয়োজিত 'বৈশাখী উৎসবে' অংশগ্রহণের অনুভূতি। সে এককথায় বললো 'অসাধারণ'। তারপর একই প্রশ্ন করলাম এম,এস,জে এর জান্নাতুন নাইমাকে, সে বললো, 'আমি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলো উপভোগ করছি। চারপাশে লাল-সাদা রঙে একাকার, অনেক ভাল লাগছে। ভার্সিটিটা কৃষ্ণচূড়া গাছের মতো লাগছে।'

ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস আয়োজিত বৈশাখী উৎসব ১৪১৯ অনুষ্ঠিত হয় ৮ই বৈশাখ শনিবার ক্যাম্পাস এ তে সকাল ১০ টা থেকে দিনব্যাপী।

আয়োজনে ছিলো ষোলোআনা বাঙ্গালিয়ানার ছোঁয়া। বায়োস্কোপ দেখানোটা ছিল তার মধ্যে একটি। বায়োস্কোপে বাংলা চলচ্চিত্রের পোস্টার দেখানো হয়েছে। অন্যান্য স্টল যেমন বৈশাখী সাম্পান থিয়েটার বসেছিল ফলের জুস ও তাজা ফল নিয়ে; ঝড়ো হাওয়া (ডিবেটিং ক্লাব) তে ঘর সাজানোর সামগ্রী , বাচ্চাদের খেলনা; এছাড়াও নিমন্ত্রণ (বিজনেস ক্লাব) , অ্যাডভেঞ্চার ক্লাব, সংস্কৃতি সংসদ, সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার ক্লাব এর ছিল নানাবিধ বৈশাখী আয়োজন, খেলাধুলাসহ অনেক কিছু। গ্রাম্যমেলা প্রাঙ্গণ মুখরিত ছিল বাংলা গানে গানে এবং ছাত্র- শিক্ষকের বাঁধভাঙা আনন্দে।

নাচ, গান , নাটক, গীতিনাট্যসহ সাংস্কৃতিক আয়োজনের মূলে ছিল মিডিয়া ক্লাব। অ্যাডভেঞ্চার ক্লাব এসেছিল বাঙালির প্রিয় খাবার পান্তাভাত আর রূপালী ইলিশ নিয়ে, ক্লাবের সদস্য মুনিরুজ্জামান জানালেন বিকিকিনিও হয়েছে প্রচুর। তাছাড়া ছিল বিভিন্ন রকমের বাতাসা, মরিচ ও রসুনের ভর্তা, আম ভর্তা।

বিদ্যুৎ গোলযোগ, অতিরিক্ত গরম কারো মধ্যেই তিক্ততা আনতে পারেনি। পুরো ইউল্যাব যেন একসাথে পাখির ডানায় চড়ে মেতেছিল আনন্দে।

অপরূপ কথা

সেপ্টেম্বর ২০১২

৫

ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস বাংলাদেশ (ইউল্যাব) ফল সেমিস্টার ২০১১তে ভিসি ও ডিন লিস্টে স্কলারশিপপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীর একাংশের সফলতার বিজয়গাঁথা তুলে ধরা হল ইউল্যাবিয়ানের পাতায়।

রুবাইয়া মতিন গীতি

মিডিয়া স্টাডিজ ও জার্নালিজম ডিপার্টমেন্ট

স্কলারশিপ পাওয়ার পর অনুভূতি অবশ্যই ভাল ছিল। কারণ স্বীকৃতি পেতে কার না ভাল লাগে। ক্লাসে যাওয়া আসার সময় যখন স্কলারশিপ তালিকাটি চোখ পরে তখন বেশ ভাল লাগে।

আসলে স্কলারশিপ পাবো এই আশা নিয়ে কখনও পড়াশোনা করিনি। তবে হ্যাঁ বলতে পারো সবসময় ভালো রেজাল্ট ধরে রাখতে চেষ্টা করছি। স্কলারশিপ পাওয়ার পর যে ব্যাপারটা মাথায় কাজ করেছে সেটা হল এই স্কলারশিপ পেয়ে বেশী খুশি হলে চলবে না।

স্কলারশিপ পাওয়ার পর পরিবারের সবাই বেশ খুশি হয়েছে। তারা আমাকে নিয়ে বেশ গর্ববোধ করে। বন্ধুরা তো সবচেয়ে বেশী খুশি হয়েছে কারণ তারা ট্রিট পাওয়ার আরেকটা সুযোগ পেয়ে গেল কিন্তু তারাও অনেক গর্ববোধ করে। আর শিক্ষক শিক্ষিকারাও একটুতো আলাদা চোখে দেখেই ।

ভাল রেজাল্ট ধরে রাখতে নতুনদের বলবো ক্লাসে নিয়মিত উপস্থিত থেকে লেকচারগুলো প্রতিদিন বাসায় যেয়ে পরে নেয়া, এসাইনমেন্ট এবং ক্লাস প্রজেক্টগুলো সময়মত দেয়া। যাই পড়াশোনার জন্য হোক না কেন তাতে আগ্রহ থাকতে হবে এবং আনন্দটা খুঁজে নিতে হবে।

আমার জানামতে, প্রত্যেক বিভাগের দুইজন সর্বোচ্চ সিজিপিএধারীকে ডিন এবং ভাইস চ্যান্সেলর স্কলারশিপ দেয়া হয়।

ভাল রেজাল্ট করেও যারা স্কলারশিপ পাচ্ছে না তার একটা কারণ হতে পারে বিশ্ববিদ্যালয়ের পদ্ধতি। আর বিশ্ববিদ্যালয়ের মান ধরে রাখার জন্য হয়তবা এটা জরুরী। তবে যাদের রেজাল্ট ভাল তারা এর ফলাফল ভবিষ্যতে কর্মক্ষেত্রে অবশ্যই পাবে।

সায়মা আক্তার

ডিপার্টমেন্ট অব ইংলিশ এন্ড হিউম্যানিটিস

এই অনুভূতি ভাষায় প্রকাশ করার মত নয়। ৪র্থ সেমিস্টারে প্রথম ভিসি লিস্টে স্কলারশিপ পাই। নোটিশ বোর্ডে নিজের নাম দেখার পর এত ভাল লাগছিল, মনে মনে ভাবছিলাম কষ্টের ফল আসলেই মিষ্টি হয়। এরপর ২০১১ সালের প্রতিটা স্কলারশিপ আমি পাই। এবারও আশা করছি যে পাব।

ভাল রেজাল্টের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল শিক্ষকদের লেকচার মনোযোগ দিয়ে শোনা। এইজন্য সব সময় ক্লাসে উপস্থিত থাকি। ক্লাস চলাকালীন সময়ে কারো সাথে কথা না বলে সম্পূর্ণ মনোযোগ ক্লাসে দেয়ার চেষ্টা করি। আমার মনে হয় ভাল রেজাল্টের লাইব্রেরি স্টাডি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের সবচেয়ে মজার ব্যাপার হল গ্রুপ স্টাডি। এতে একদিকে যেমন আড্ডা দেয়া হয় তেমনি আরেকদিকে পড়াশুনাটাও হয়।

কোন কোর্সে কোনও কিছু বুঝতে অসুবিধা হলে আমার বাবা ও শিক্ষকরা আমাকে অনেক সহযোগিতা করে। সেক্ষেত্রে, যাদের নাম না বললেই নয় তারা হলেন শাহনেওয়াজ কবির, শাঈখ সালেহিন, শাহিন আরা ও তাহমিনা জামান।

আমি পড়তে খুব ভালবাসি। পড়ার বইয়ের পাশাপাশি গল্পের বই পড়তে খুব ভালো লাগে। তাই প্রতিদিন আমার কোন গল্পের বই বা উপন্যাসের কমপক্ষে ২-৩ পৃষ্ঠা পড়া চাইই চাই।

আমি মনে করি ইউল্যাবের ইংরেজি বিভাগ খুবই ভালো। এখানে পড়তে এসে আমি অনেক কিছু জেনেছি- শিখেছি যা আমার সারা জীবন কাজে লাগবে।

ভবিষ্যতে আমি সাইকো এনালাইসিস এক্সপার্ট হতে চাই। কারণ বাংলা ভাষায় এখনও পর্যন্ত সাইকো এনালাইসিস বিষয়ে বিশদ গবেষণা হয়নি। আমি চাই এই বিষয়কে বাংলা ভাষাভাষীদের কাছে পরিচিত করে তুলতে। আর এই ব্যাপারে আমাকে সবচেয়ে বেশি উৎসাহ দিয়েছেন অধ্যাপক সলিমুল্লাহ খান।

সানজানা রহমান

মিডিয়া স্টাডিজ ও জার্নালিজম ডিপার্টমেন্ট

স্কলারশীপ পাওয়ার পরের অনুভূতি আসলে বলে বা লিখে বোঝানো সম্ভব না। অনেকটা টেনশন, অনিশ্চয়তার পর যখন নোটিশ বোর্ডে নিজের নামটা চোখে পরে তখন মনে হয় আমার জীবনে আর কিছু পাওয়ার নাই! যদিও কিছুদিন পরই এই অনুভূতি অনেকটাই চলে যায় নতুন সেমিস্টারের চাপে।

বাবা মা বা কাছের মানুষদের আনন্দটা ঠিক আমার মতো না হলেও আমার চেয়ে খুব একটা কম না। বন্ধুদের পার্টি করার একটা উপলক্ষ্য চলে আসে এর সাথে! তবে বাবা মা অথবা টিচাররা যখন অনেক গর্ব করে বলে 'ও তো আমাদের মেয়ে'। এর চেয়ে আনন্দের মুহূর্ত আর কিছু থাকতে পারে না।

ভাল রেজাল্ট ধরে রাখার মন্ত্র অবশ্য আমার কাছেও নেই। থাকলে হয়ত আমার রেজাল্ট এখন আর ভাল থাকতো। তবে আমার ভুল থেকে যদি বলি, অন্তত প্রত্যেক সপ্তাহে যদি একদিন পড়ার জন্য বরাদ্দ রাখা যায় তাহলেই আর কিছু লাগে না। বাচ্চাদের মতো পড়া না, অন্ততঃ সারা সপ্তাহ কি কি পড়ান হয়েছে সেটা একটু রিভিউ করে নিলেই হয়ে যায়। আর এসাইনমেন্টগুলো একটু কষ্ট করে সময় মতো জমা দিয়ে দেওয়া।

বিভিন্ন ধরনের স্কলারশীপ দেওয়া হয় আমাদের ইউনিভার্সিটিতে। রেজাল্ট এর ভিত্তিতে দেওয়া হয় তিন ধরনের স্কলারশীপ। এর মাঝে ডীন আর ভাইস চ্যান্সেলার এ্যাওয়ার্ড দেওয়া হয় প্রত্যেক সেমিস্টারের রেজাল্ট এর জন্য। দেওয়া শুরু হয় সাধারণত চতুর্থ সেমিস্টার এর পর থেকে। সব ডিপার্টমেন্টের মধ্যে সর্বোচ্চ সিজিপিএ প্রাপ্ত দুই জনকে দেয়া হয়। এর জন্য কোথাও আবেদন করতে হয় না।

সবচেয়ে সম্মানিত হল নেইমড স্কলারশীপ। এক্ষেত্রে পড়াশুনার পাশাপাশি কিছু এক্সট্রা কারিকুলার এক্টিভিটিস প্রয়োজন এবং প্রয়োজন সার্কুলার দেওয়ার সাথে সাথে আবেদন করার। তবে, রেজাল্টে কোন সময় কোন কোর্স উইথড্র থাকলে কোন স্কলারশীপ পাওয়া যাবে না, তা যেকোন কারণে হোক না কেন।

সিফাত ই সেহ্‌রিন

কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং

এই অনুভূতি ভাষায় প্রকাশ করার মত নয়। সেইদিনটি আমি আমার বন্ধু-বান্ধব ও অভিবাবকের সাথে উদ্‌যাপন করি। আমার এই সাফল্যে আজও আমাকে স্মরণ করিয়ে দেয় আমার বাবা-মায়ের আনন্দভরা মুখ। সেই মুহূর্ত আসলেই অনেক গর্বের যখন আমার মনে হয়েছে আজ আমার জন্যে আমার বাবামায়ের মুখ উজ্জ্বল। আর এই জিনিসটাই আমাকে আরো উৎসাহিত করে পরের সেমিস্টারগুলোতে ভাল রেজাল্ট করার জন্য। তবে এটি খুব সহজ কাজ ছিলনা কারণ আমাদের বিভাগে অনেক ভাল ছাত্র রয়েছে। প্রতিযোগিতায় টিকে থাকাটা একটু কঠিন। পর পর চারবার ডীন লিস্টে স্কলারশিপ পাবার পর আমার স্বপ্ন ছিল ভিসি লিস্টে স্কলারশিপ পাওয়া। আর অবশেষে আমার কঠোর পরিশ্রমের পর ২০১১ সালের ফল সেমিস্টারে আমি ভিসি লিস্টে স্কলারশিপ পাই।

ডিপার্টমেন্টে সর্বোচ্চ জিপিএ ধরে রাখা খুব সহজ কাজ নয়। অনেক ভাল ছাত্রের সাথে প্রতিযোগিতায় নিজের স্থান বজায় রাখাটা কঠিন। কিন্তু, এরজন্য সবার আগে প্রয়োজন শতভাগ উপস্থিতি। বই পড়ে বোঝা আর ক্লাসে স্যারের লেকচার শোনা এক নয়। কারণ ক্লাসে কোনও কিছু না বুঝলে আমি স্যারকে প্রশ্ন করতে পারছি কিন্তু বই এর ক্ষেত্রে তা সম্ভব নয়। আর দ্বিতীয়ত, প্রতিদিন পড়াশুনা করা ছাড়া কোন বিকল্প নেই। আমাদের কম্পিউটার ও ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে কিছু কোর্স আছে। যেমন, প্রোগ্রামিং ও গণিত যা নিয়মিত চর্চা করতে হয়। এতে বিষয়গুলো আরো স্পষ্ট বোঝা যায়। তবে এসবকিছুর উপরে কয়েকজন শিক্ষকের উৎসাহ আমাকে আরও অনুপ্রাণিত করে। তারা হলেন, অমিতাভ পাল (সিএসই), শরিফউদ্দিন (ইটিই), সজিব কুমার মিস্টি (সিএসই), সুমাইয়া ইকবাল (বুয়েট), নাসরিন ইসলাম (ডিইএইচ), আব্দুল্লাহ আল মামুন (ডিইএইচ), সুকরন বড়ুয়া (বুয়েট), হাসানুজ্জামান ভুইয়া।

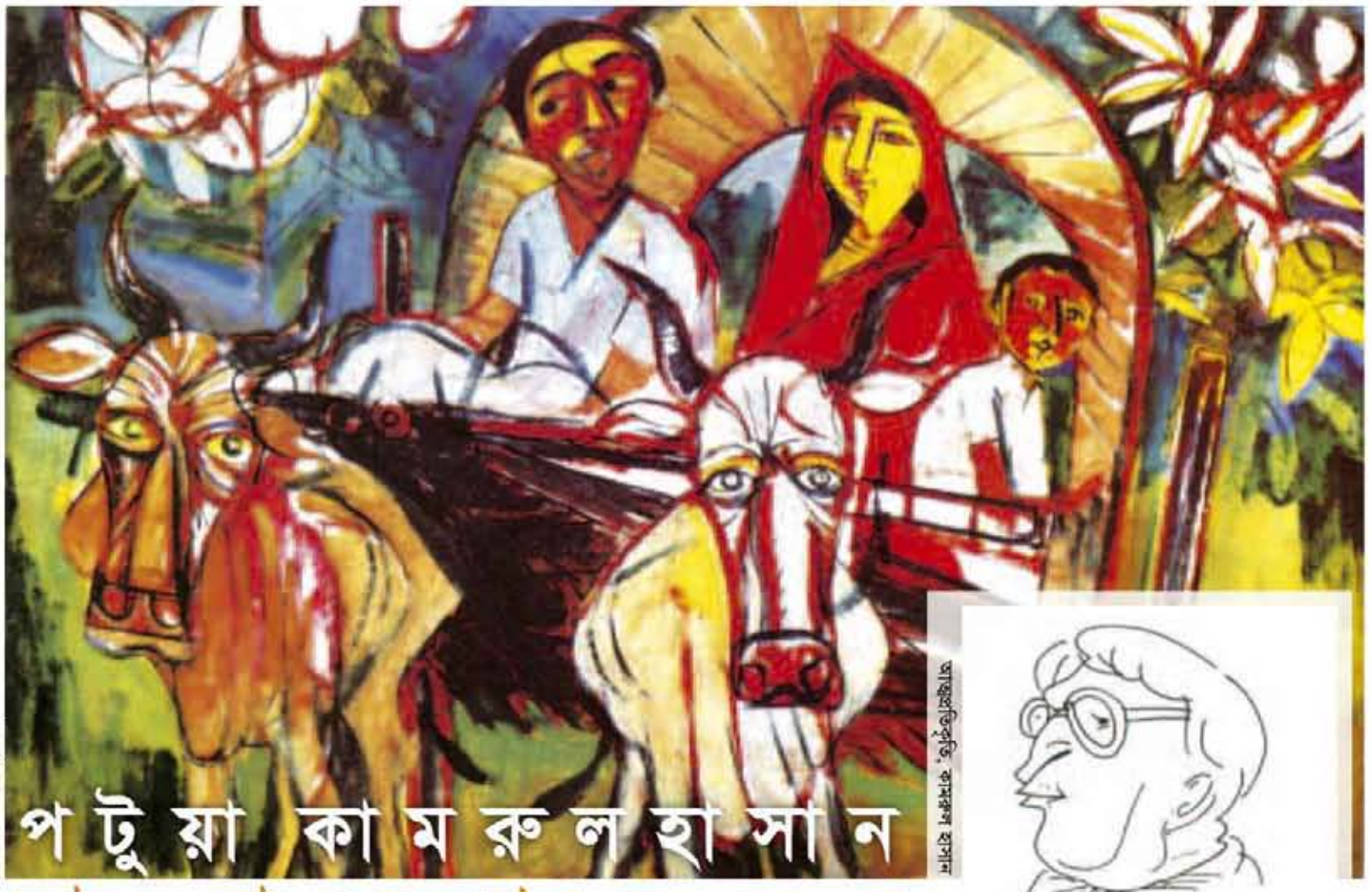

'নাইওর', কামরুল হাসান

'আত্মপ্রতিকৃতি', কামরুল হাসান

পটুয়া কামরুল হাসান

বাস্তবতা ও স্বপ্নের মেলবন্ধন

ছোটবেলা থেকেই বড় হয়েছি একটা অন্যরকম আবহে, বলা যায় অনেকটা শৈল্পিক চিন্তা চেতনার আধারে। এর সাথে বাবা-মার মুখে শুনেছি অনেক গল্প, অনেক জ্ঞানী গুনী মানুষের কথা, তখন চিন্তা করতাম, এরা কারা? কী করে? যাই করে কেন করে ইত্যাদি ইত্যাদি। এর মাঝে অন্যরকম কিছু গল্প ছিলো, যা আমাকে অভিভূত করতো, নিয়ে যেত অন্য এক দুনিয়ায়। সে দুনিয়াটা নিছক স্বপ্নের না, তার সাথে সযত্নে মেশানো ছিলো বাস্তবতা।

একজন শিল্পীর কাজ কী শুধুই স্বপ্ন দেখানো বা স্বপ্নের কথা বলা, আসলে আমার মতে তাদের কাজ হলো স্বপ্নের মাঝে বাস্তবতার নির্যাসটুকু ঢেলে তাকে অন্তরের অন্তস্থলে নিয়ে নাড়া দেয়া। পটুয়া কামরুল হাসান , বহুল পরিচিত নাম সুধী মহলে। যারা বহু আগে থেকে শিল্প-সাহিত্য ও এর চর্চার সাথে সম্পৃক্ত তারা একনামে চিনে নেন। এই মহান শিল্পীর শিল্পতেই আমি সরলতরভাবে বাস্তবতাকে বুঝতে শিখি।

আমার কাছে কামরুল হাসান বাস্তবতার শিল্পী, প্রথম দিকের কাজগুলো দেখলে বোঝা যায় তিনি আশেপাশের পরিবেশ থেকে প্রবল ভাবে উদ্বুদ্ধ হয়ে সেগুলোকে রূপক আকারে অন্য একটা রূপে তার ক্যানভাস এ ফুটিয়ে তুলতেন। উদাহরণ এ বলতে পারি তার দুর্ভিক্ষের সিরিজের কথা। কাক, শকুন, কুকুর, মানুষ দিয়ে একদম স্পষ্টভাবে দুর্ভিক্ষের কথা প্রকাশ করা, আবার সেই কাক, শকুন, কুকুর, মানুষ দিয়ে পরবর্তীকালের শাসন শোষণ এর বিপক্ষে দৃঢ় হাতে তুলির আচড়।

আবার নারীকে প্রাধান্য দেয়ার মাঝে খুঁজে পাওয়া যায় পাবলো নেরুদার ছোঁয়া। নারীকে নিয়ে ছবিগুলোয়, শুধুই নিছক নারী, তার কাজ আর ভালোবাসা কে প্রাধান্য দিলেও পরবর্তীকালের ছবিগুলোতে অধিবাস্তবতার সংমিশ্রনে সেই নারীকে নিয়ে গেছেন অন্য উচ্চতায়।

তার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কাজগুলো হলো একাত্তরের পোস্টার এবং তার তুলির নীরব অথচ দৃপ্ত আন্দোলন আর এরশাদের পতনের তথা স্বৈরাচার পতনের আন্দোলন। এই জানোয়ারদের ধরিয়ে দিন বা বাংলাদেশ আজ বিশ্ববেহায়ার খপ্পরে, সবগুলোতে তিনি নিজেকে ছাপিয়ে গেছেন। হাতে শেকল পরা ক্ষুব্ধ পটুয়ার আন্দোলন, মানুষের রক্তে তখন যারা আনে রুখে দাড়ানোর শক্তি, ৮৯ এর স্বৈরাচার পতনের আন্দোলন শুরু হয় তার নিজ মুখমন্ডলের বিকৃত ছবির পোস্টার দিয়ে।

প্রত্যেকক্ষেত্রেই বাস্তবতা ভিন্ন, যার একটা ভাগ

'তিনকন্যা', কামরুল হাসান

আক্ষরিক অন্যটা রূপক। যদি জিজ্ঞেস করা হয় এতে কী শেখার আছে, তাহলে বলবো...অনেক কিছু যা একজন মানুষকে প্রকৃত মানুষ করে তোলে।

ব্রতচারী আন্দোলন, বডি বিল্ডিং এবং আবৃত্তি করতেন। ব্রতচারী আন্দোলন দিয়ে গড়ে তুলেছিলেন মুকুল ফৌজ, যার মূল লক্ষ্য ছিলো নতুন প্রজন্মের মাঝে দেশপ্রেম জাগ্রত করা এবং মানুষের মতো মানুষ করে বেড়ে ওঠার প্রথম ধাপগুলো তৈরি করে দেয়া।

আমি বড় হয়েছি তার কাজের মাঝে, সামনে থেকে দেখার সৌভাগ্য হয়নি কিন্তু আমি তাকে দেখেছি তার কাজ দিয়ে।

তার প্রচুর ছোট ছোট কলমে আঁকা ড্রইং আছে যার একটার সাথে অন্যটার পুরো মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। এক একটা স্কেচ তার এক এক সময়ের মানসিকতার কথা প্রকাশ করে। বলা দরকার খেরো খাতার কথা। সারাদিনের কৃতকাজ লিপিবদ্ধ করা তার অন্যতম শখ ছিলো, এর থেকেই খেরো খাতার জন্ম। এই খেরো খাতা হলো তার অন্যতম শৈল্পিক সৃষ্টি। এর প্রত্যেক পাতায়, প্রত্যেকটি লাইন কী সুনিপুণভাবে গুছিয়ে লেখা যেন দেখলেই পড়তে ইচ্ছে করে। রাগ ক্ষোভ দুঃখ ভালবাসা স্নেহ আদর সব আবেগের সম্মিলন ঘটে যাওয়া এক অন্যরকম দিনপঞ্জি।

মানুষের প্রতি মানুষের ভালবাসা না থাকলে এই পৃথিবী অচল হয়ে যাবে অচিরেই, যদি মানুষ তাদের উপর করা অনাচার অবিচারের বিরুদ্ধে রুখে না দাড়ায় তাহলে কে বাঁচাবে? শিল্পে কী নগ্নতা বলতে কিছু আছে? আমার জানা মতে নেই, যদি তাঁর ড্রইংগুলোকে শৈল্পিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হয় তাহলে মানব মানবীর নিছক ভালবাসা এবং কৌতুহল ফুটে আছে প্রত্যেকটিতে।

তাঁর কাজে সরলতা ও বাস্তবতা এবং জটিলতার সৌন্দর্য একাত্ম। তাঁর কাজ তাঁর প্রতিভা, দক্ষতা ও কৌশল বরং তাঁর ব্যক্তিগত নীতির ও দর্শনের একটি প্রতিফলন যা কখনই নিছক প্রদর্শনী ছিল না।

অমৃতা হাসান

কিংবদন্তী
সেপ্টেম্বর ২০১২

হুমায়ূন আহমেদ

স্কেচ - তৌহিদুর রহমান

'খুব কাছের কোনো মানুষ যখন হারিয়ে যায় মৃত্যু নামক অমোঘ সত্যের প্রাচীর পেরিয়ে তখন অনুভূতির দেয়াল অবশ হয়ে পড়ে...'

হুমায়ূন আহমেদের কথা বলছিলাম। না, তিনি আমার খুব কাছের কোনো মানুষ ছিলেন না। সত্যি বলতে, কাছ থেকে তাঁকে দেখার সৌভাগ্যও আমার এ জীবনে হয়ে ওঠেনি। কিন্তু যে রাতে তিনি পৃথিবীর ওপাশের পৃথিবীটাতে পাড়ি জমালেন, তাঁর চলে যাওয়ার খবর শুনে বুকের ভেতরটাতে অন্য সবার মত কেমন যেন হাহাকার করে উঠলো, হয়তো বা একটু বেশিই; কি করে বলি ব্যথা পরিমাপ করার কোনো যন্ত্র যে এখনো আবিষ্কার হয়নি! বারবার মনে হয়েছে, গুরুত্বপূর্ণ কিছু হারিয়ে ফেলেছি, নিজের মাঝে একটা শূন্যতা অনুভব করেছি।

হুমায়ূন আহমেদের সাথে পরিচয় বেশ ছোটবেলায় 'কোথাও কেউ নেই' নাটক দিয়ে। নাটকের কাহিনী ঝাপসা হয়ে গিয়েছিলো। ইন্টারনেটের বদান্যতায় এইতো মাত্র কিছুদিন আগে নাটকটি পুনরায় দেখার সুযোগ হয়েছে। বাকের ভাই, বদি, আর 'হাওয়া ম্যায় উড়তা যায়ে' কতগুলো বছর পর! নাটকের শেষাংশে বাকের ভাইয়ের করুণ পরিণতি দেখে এই যৌবনে এসেও চোখের পানি ধরে রাখতে পারিনি। মনে আছে, নাটকে বাকের ভাই চরিত্রের ফাঁসির রায় শুনে রাস্তায় মিছিল বের হয়েছিল। স্লোগানটা ভুলে গিয়েছিলাম, কোনো এক বড় ভাই তা মনে করে দিলো সেদিন। 'বাকের ভাইয়ের কিছু হলে জ্বলবে আগুন ঘরে ঘরে'! অদ্ভুত সৃষ্টি! সেই নাটক সমগ্র জাতিকে পুরোপুরি বুঁদ করে ফেলেছিল।

মায়ের হাত ধরে প্রথম সিনেমা হলে গিয়ে বাংলা ছবি দেখা, নাম 'শঙ্খনীল কারাগার'। লেখক হুমায়ূনের সাথে পরিচয় সম্ভবত ক্লাস সিক্সে পড়ার সময়। সেই বয়সেই সত্যজিতের ফেলুদার পাশপাশি হুমায়ূন আহমেদের বই হাতে তুলে নিয়েছিলাম, তারপর আর নামিয়ে রাখার সাহস বা ইচ্ছা কোনোটাই হয়নি। তাঁর সৃষ্ট জনপ্রিয় তিনটি চরিত্র হিমু, মিসির আলি, শুভ্র। সত্যি বলতে, এ তিনটি চরিত্রের মাঝেই আমি লেখক হুমায়ূনকে খুঁজে পাই হিমুর পাগলামো, মিসির আলির উপস্থিত বুদ্ধি, চুলচেরা বিশ্লেষণ; আর শুভ্রর মোটা চশমা ও অসম্ভব বইপ্রীতি। হ্যাঁ, মানুষের মাঝে পাগলামো থাকে, হুমায়ূন আহমেদও এর ব্যতিক্রম ছিলেন না। ভরা পূর্ণিমার রাতে জোছনাস্নান করতেন, মাঝে মাঝেই গানের আসর করে তার মধ্যমণি হয়ে বসে পড়তেন। লেখক হুমায়ূন কি জানতেন, তার বইগুলো পড়ে পড়েই আমি বৃষ্টি আর জোছনা ভালোবাসতে শিখেছি?!?

ট্রেন ভ্রমণ এমনিতে খুব একঘেয়ে, ক্লান্তিকর বলে ঠেকে। আর যদি একলা থাকি তো সে অনুভূতি সংজ্ঞাতীত। এরকম কোনো এক সকালে ট্রেনে করে চট্টগ্রাম থেকে ঢাকা ফিরছিলাম। প্রথম কিছুক্ষণ গান শুনে খানিক পর ব্যাগ থেকে লেখকের 'হলুদ হিমু কালো র‍্যাব' বইটা বের করেছি। পুরো বইটাতে এমনভাবে নিমজ্জিত হয়েছিলাম কখন যে 'হাঃ হাঃ হিঃ হিঃ' করে হাসা শুরু করেছি খেয়াল হয়নি, হঠাৎ আশেপাশে তাকিয়ে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলাম, কাছেপিছের মানুষগুলো কিছুটা অস্বস্তি আর কিঞ্চিত বিরক্তি নিয়ে তাকিয়ে আছে। পাত্তা না দিয়ে আবার বই পড়ায় মনোযোগ দিলাম, কিছুক্ষণ পর সেই একই ঘটনার পুনুরাবৃত্তি। একটা মানুষের এত বিস্ময়কর 'সেন্স অব হিউমার' হয় কি করে! মানুষ হুমায়ূন আহমেদের কোন দিকটি সবচেয়ে ভালো লাগে এমন প্রশ্নের জবাবে আমি বলবো তাঁর সুতীক্ষ্ণ রসবোধ। লেখকের 'বহুব্রীহি' উপন্যাসটি এর উৎকৃষ্ট একটি উদাহরণ হতে পারে।

মুক্তিযুদ্ধ দেখিনি, কিন্তু 'আগুনের পরশমণি' দেখেছি, 'জোছনা ও জননীর গল্প' পড়েছি। একজন বাঙালী যে মুক্তিযুদ্ধ দেখেনি অথচ ৭১ সম্বন্ধে জানতে চায়, 'জোছনা ও জননীর গল্প' থেকে ভালো কোনো উপন্যাস আর হতে পারে না। গল্পের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস জানার জন্যে এটি একটি চমৎকার একটি বই।

আমাদের দেশে সম্ভবত এই একটি মাত্র চলচ্চিত্র যেটা দেখে আমি অশ্রু সংবরণ করতে পারিনি 'আগুনের পরশমণি'! এ ছবি দেখে যার হৃদয় ব্যথিত হবে না, নয়ন অশ্রুসিক্ত হবে না, সে কোনো ভাবেই মানুষ হতে পারে না; তাকে অনুভূতিহীন একটা রোবোট বলা চলে মাত্র। শুধু তাই নয়, বাংলাদেশে এ যাবতকালে যত চলচ্চিত্র তৈরি হয়েছে 'আগুনের পরশমণি'কে আমি নির্দ্বিধায় প্রথম পুরস্কার দিয়ে দিতে পারি।

পুরো পৃথিবীটাতে সমালোচোকের অভাব কখনই হবে না। অনেকে বলেন, লেখক হুমায়ূনের সাহিত্যের মান ভালো ছিল না। সাহিত্যের মান উৎকৃষ্ট কি নিকৃষ্ট জানি না, সেটা পুরোপুরি আপেক্ষিক একটা বিষয়। তবে স্বীকার করছি, তিনি তাঁর লেখনী জীবনে উচ্চমার্গীয় সাহিত্য তেমনভাবে চর্চা করেননি। তিনি বরাবরাই চেষ্টা করেছেন তাঁর সাহিত্যকর্মের ভেতর দিয়ে নির্মল আনন্দ প্রদানের মাধ্যমে দারিদ্র, দুঃখ-দুর্দশা, হতাশাগ্রস্ত বাঙালীকে তার কষ্ট ভুলিয়ে রাখতে। তাঁর বই ধরার পর সেটা শেষ না করা পর্যন্ত নামিয়ে রাখা হতো না কখোনোই। আর একজন সফল সাহিত্যিকের এর চেয়ে ভালো কোনো উদাহরণ হতে পারে বলে আমার ধারণাতে নেই। লেখক হুমায়ূনের সুন্দর কিছু সাহিত্যকর্মের নাম বলতে গেলে যেসব নাম আমার মনে আছে সেগুলো হল 'নন্দিত নরকে', 'শঙ্খনীল কারাগার', 'বহুব্রীহি', 'তুমি আমায় ডেকেছিলে ছুটির নিমন্ত্রনে', 'দারুচিনি দ্বীপ', 'বৃষ্টিবিলাস', 'আঙ্গুল কাটা জগলু', 'মিসির আলীর অমীমাংসিত রহস্য', 'হিমুর হাতে কয়েকটি নীলপদ্ম', 'চলে যায় বসন্তের দিন', 'আজ আমি কোথাও যাব না', 'আমিই মিসির আলী', 'জোছনা ও জননীর গল্প', 'বাদশাহ নামদার'। বিশ্বসাহিত্যকেন্দ্রের ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরী হোক বা বইমেলায় অন্যপ্রকাশের বুকস্টল, ধাক্কাধাক্কি করে হোক বা লাইনে দাঁড়িয়ে হুমায়ূন আহমেদের বইটাই যে সবার প্রথমে লুফে নিতে চাইতাম সবসময়। আগামী দিনগুলোতে বইমেলায় হুমায়ূন আহমেদের নতুন কোনো বই বের হবে না এটা কেন যেন মেনে নিতে পারছি না, কোনোভাবেই না!

সাধারণ, অসাধারণ কিভাবে পৃথক করতে হয় জানেন? সাধারণের মৃত্যুতে শুধুমাত্র তার পরিবার, আত্মীয়স্বজনরাই কাঁদে, আর একজন অসাধারণের চলে যাওয়া পুরো জাতিকেই অশ্রুসিক্ত করে যায়, গন্তব্যহীন ফেলে যায়। হুমায়ূন আহমেদ সাধারণ কি অসাধারণ সেটা পাঠকদের বিবেচনার ওপরই ছেড়ে দিলাম।

তাশফিক মাহমুদ

চিত্রকর্ম: কামরুল হাসান

নারীকে নারী হিসেবে নয় মূল্য দিতে হবে মানুষ হিসেবে

পায়রাবন্ধের বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন তার শিকল ভেঙ্গে বেরিয়ে এসেছিলেন, পেয়েছিলেন নারীমুক্তির আশ্বাস। প্রীতিলতা ওয়াদেদ্দার নারী হয়েও পুরুষ সহযোদ্ধাদের সঙ্গে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন যোগ দিয়েছিলেন। সভ্যতার ক্রমবিকাশের পরতে পরতে জড়িয়ে আছে তাদের অসীম ত্যাগের কাহিনী। পৃথিবীর পট পরিবর্তনের প্রতিটি ধাপ সেই সাহসী পদচিহ্নের আভায় উজ্জ্বল। তবুও সৃষ্টির আদি থেকে আজ পর্যন্ত নারীরা অবহেলিত, লাঞ্ছিত, দলিত এবং সর্বোপরি বঞ্চিত। পরিবার, সমাজ এবং রাষ্ট্র প্রতিটি স্তরে আজ চলছে নারী পীড়ন। আমরা যতই সভ্যতা, আধুনিক সমাজব্যবস্থা এবং প্রগতিশীলতার কথা বলি তবুও নারীদের অবস্থান রয়ে যায় সেই অন্ধকারেই। কিন্তু এই একবিংশ শতাব্দীতে এসেও নারীদের এই শোচনীয় অবস্থা কি সত্যিই কাম্য? এখনও কি সেই সময় আসেনি যখন নারীকে নারী হিসেবে নয়, গন্য করা হবে মানুষ হিসেবে।

মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব এবং এ কারণেই বোধহয় মানুষের মাঝে এমনসব গুণাবলি রয়েছে যা অন্য প্রাণীতে অনুপস্থিত। যেসব বৈশিষ্ট্য থাকলে মানুষকে মানুষ হিসেবে বিবেচনা করা হয় তার মধ্যে রয়েছে মানুষের মৌলিক চাহিদা, ভাল-মন্দ বিচার করার ক্ষমতা, অধিকার সচেতনতা, চিন্তা–ভাবনার স্বাধীনতা, নৈতিকতাবোধ, মূল্যবোধ, মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা, প্রতিনিয়ত পুরনোকে ভেঙ্গে নতুনকে গড়ার প্রয়াস ইত্যাদি। কিন্তু এই বিষয়গুলোতে নারীরা পুরুষের মতন সমানভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে না, তারা অধিকার বঞ্চিত হয়। এগুলোর প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে নারীরা দলিত, মথিত এবং বঞ্চিত।

পরিবারে নারী পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। যেহেতু পুরুষ অনেকাংশেই অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করে সে জন্য পরিবারেও তার থাকে ব্যাপক আধিপত্য। নারীরা পরিবারে যে নিরলস শ্রম দিয়ে যাচ্ছে তার স্বীকৃতিও তারা পায় না। সুতরাং নারীকে অর্থনৈতিকভাবে আরো বেশি স্বাবলম্বী হতে হবে। পরিবারে পুরুষ সদস্যদের পাশাপাশি নারীকেও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অবদান রাখতে হবে।

এ সমাজে পুরুষদের যেমন স্বাধীনতা দেওয়া হয়, প্রাধান্য দেয়া হয়, নারীরা তেমন পায় না। একজন নারীকে তার অধিকারগুলো আদায় করে নিতে হয়। সমাজে অনেক সময়ই পর্দাপ্রথার নামে নারীকে গৃহবন্দী করে রাখা হয়। ধর্মীয় অনুশাসনের দোহাই দিয়ে তাদেরকে শিক্ষা, অর্থনীতি ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাদের অংশগ্রহণে বাধাগ্রস্ত করা হয়। এবং পুরুষের কায়েমি স্বার্থবাদ ও ভোগ-লিপ্সা পূরণ করার ক্ষেত্রেও মাঝে মাঝে ধর্মের অপব্যাখ্যা প্রদান করে নারীদের স্বাভাবিক চলাফেরাকে বাধাগ্রস্ত করে।

আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে বর্তমানে নারীরা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যথপোযুক্ত অবদান রাখছে। গার্মেন্টস শিল্পে শতকরা ৮০ ভাগ শ্রমিকই হলো নারী। মূলত তারাই আমাদের এই শিল্পকে টিকিয়ে রেখেছে। কিন্তু এক্ষেত্রেও নারীদের প্রকৃত মূল্যায়ন করা হয় না, তাদেরকে তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়ে থাকে। সেই কাক ডাকা ভোর থেকে শুরু করে সন্ধ্যা পর্যন্ত অমানুষিক শ্রম দিয়েও তাদের ন্যায্য মজুরি পায় না। এমনকি মাতৃকালীন ছুটি এবং চাহিদা অনুযায়ী চিকিৎসার সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়। আমাদের গৃহে যে নারীরা অক্লান্ত শ্রম দিয়ে যাচ্ছে তার মূল্যায়ন করা হচ্ছে না। গৃহশ্রমে যে নারীরা অবদান রাখছে এবং শ্রম গৃহে উৎপাদন হয়ে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে তা অর্থের মানদন্ডে দেখতে হবে। যে নারীরা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আসে তারা মূলতঃ পুরুষবাদী চিন্তা-ভাবনাগুলোকে বাস্তবায়ন করার জন্য কাজ করে। নারীদের অধিকার, তাদের দাবী-দাওয়া এ বিষয়গুলো নিয়ে তারা কখনো ভাবেনা। সংসদে যে ৪৫টি আসন সংরক্ষিত আসন রয়েছে তাও সরাসরি জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নয় রাজনৈতিক নেতাদের সমর্থন অনুযায়ী আসে। এ কারণে তারাও তাদের স্বাধীন মত প্রকাশ কিংবা সরাসরি নারীদের জন্য কিছু করার ক্ষমতা পায়না।

যখন বিজ্ঞাপনে বা চলচিত্রে নারীকে কোনো পণ্যের সাথে উপস্থাপন করা হয়, তখন সেই পণ্যটির সাথে নারীও একটি পণ্যরূপে উপস্থাপিত হয়। এ অবস্থার অবসান জরুরী। অতএব বিজ্ঞাপনে নারীকে দৃষ্টিকটু ভঙ্গিতে, অশ্লীলভাবে, যে বিজ্ঞাপনে নারীর সংশ্লিষ্টতা নেই (যেমন- সিগারেটের বিজ্ঞাপন) সেইসব প্রদর্শন বন্ধ করতে হবে এবং আরো প্রগতিশীল করে নির্মাণ করতে হবে।

সাহিত্য থেকে শুরু করে পৃথিবীর প্রতি পরিবর্তনে পুরুষের পাশাপাশি তারাও জোড়ালো ভূমিকা রেখেছে। যুদ্ধক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করেই হোক, সাহায্য সহযোগীতা কিংবা অনুপ্রেরণা দিয়েই হোক, নারীর অবদান অপরিসীম। তাইতো জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বলেছেন:

এ বিশ্বে যতো ফুটিয়েছে ফুল
ফুলে আছে যতো গন্ধ
নারী তারে দিল রূপ, রস, মধু
গন্ধ সুনির্মল

রোকেয়া, তারামন বিবি, সুফিয়া কামাল, জাহানারা ইমাম এরা সবাই নারীমুক্তির পথিকৃৎ। তারা স্ব স্ব অবস্থানে থেকে সামাজিক অচলায়তন ভেঙ্গে সামনে এগিয়ে গেছেন, নারী মুক্তির আলোকবর্তিকা প্রতিটি ঘরে ঘরে পৌছে দিয়েছেন। তাদের অবদান অপরিসীম। আজ আমরা তাদেরকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি। ক্লারা জেটকিন ১৮৫৭ সালে নিউইয়র্ক বস্ত্র শিল্পে নারী শ্রমিকদের ৮ ঘণ্টা কাজের সময় নির্ধারণসহ অন্যান্য দাবি-দাওয়াগুলো বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে আন্দোলন করেছিলেন এবং ৮ মার্চকে আন্তর্জাতিক নারী দিবস হিসেবে ঘোষনা করেন। আজ বিশ্বের প্রতিটি নারী ৮ মার্চে তাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে।

পরিশেষে বলা যায় যে, এ পৃথিবীকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য, প্রগতিশীল পথে সমান তালে চলার জন্য আজ সময় এসেছে নারীর অচলায়তন ভেঙ্গে তাকে নারী হিসেবে নয়, জানতে হবে মানুষ হিসেবে, তাকে মানুষের মূল্য দিতে হবে। স্বপ্ন দেখাতে হতে তার অধিকারগুলো ফিরিয়ে দিতে হবে মানুষ হিসেবেই। কারণ সমাজ-প্রগতির বিকাশে পুরুষরা কখনো একা অবদান রাখেনি। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, সেইসব কৃতী পুরুষের পাশে নারীর নামটিও উজ্জ্বল রয়েছে। একবিংশ শতাব্দীতে এসে এখন সময় এসেছে নারীকে নারী হিসেবে নয় মানুষ হিসেবে মূল্য দিতে হবে। বর্তমানে তথ্য প্রযুক্তির পৃথিবীর সঙ্গে সমানতালে এগিয়ে যাবার জন্য নারী-পুরুষের অংশগ্রহণের মধ্যেই নারীমুক্তি নিশ্চিত হবে এবং নারীরা নারী হিসেবে নয়, মানুষ হিসেবেই পরিগণিত হবে।

কানিজ ফাতেমা

বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ
আশার ছলনে ভুলি...

> “সবাই তো স্কলারশিপ নিয়ে দেশের বাইরে গিয়ে চলচ্চিত্রের ওপর পড়াশোনা করতে পারে না, তাই দেশের মধ্যেই একটি ইনস্টিটিউট হোক”

ছবি: ইন্টারনেট

সেই ৭০-এর দশকে চলচ্চিত্র নির্মাতা আলমগীর কবির, বাদল রহমান-সহ অনেকের চেষ্টায় প্রাণ পেয়েছিল যে সংগ্রহশালা, তা যেন আজ স্থান সংকুলানের অভাবে বাঘের গলায় আটকে যাওয়া হাড়ের দশায়। কিন্তু গল্পের সেই বকপাখিটা কোথায়? অন্ততঃ সেই পাখিটা পেলে গল্পটার শেষ অংশ বদলে দেওয়া যেতো। বলা হচ্ছে বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভের কথা।

এই সংগ্রহশালা হতে পারতো স্বাধীনতাত্তোর চলচ্চিত্রে বাঙালি রেনেসাঁর সূতিকাগার; হতে পারতো চলচ্চিত্র পাঠ ও গবেষণার অনবদ্য ক্ষেত্র। কারণ এর উদ্দেশ্য ছিল সুদূরপ্রসারী। ‘সবাই তো স্কলারশিপ নিয়ে দেশের বাইরে গিয়ে চলচ্চিত্রের ওপর পড়াশোনা করতে পারে না, তাই দেশের মধ্যেই একটি ইনস্টিটিউট হোক’ আর্কাইভ নিয়ে এমনি ভাবনা ছিলো চলচ্চিত্র আন্দোলনের পুরোধাব্যক্তিত্ব প্রয়াত চলচ্চিত্রকার বাদল রহমানের। কিন্তু শেষমেষ কিছুই হয়নি, অথবা হয়ে উঠতে পারেনি যা হওয়ার কথা ছিলো এর। ফলে একটি মহীরুহ যেন তার শেষ পরিণতি পেলো বনসাঁই-এ।

যুদ্ধোত্তর ভগ্নাবশেষে দাঁড়িয়ে বদলে যাওয়ার কথা দিয়েই শুরু হয়েছিলো ‘বাংলাদেশ চলচ্চিত্র আন্দোলন’ এর সমান্তরালে ‘বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ’ আন্দোলন। আলমগীর কবির, বাদল রহমান, সালাউদ্দিন জাকী প্রমুখের চেষ্টায় প্রথম ফিল্ম এপ্রিসিয়েশন কোর্সের যাত্রা শুরু হয়েছিলো ৭০-দশকের শেষদিকে। সেই সময় চলচ্চিত্রকর্মীদের দুর্বার আন্দোলনের মুখে সরকার ঘোষণা দেয় ‘ফিল্ম ইনস্টিটিউট অ্যান্ড আর্কাইভ’ প্রতিষ্ঠার। তুমুল স্বপ্নের ভেতর দিয়ে ইনস্টিটিউট আনুষ্ঠানিকভাবে কাজ শুরু করে ১৯৭৮ সালের ১৭ মে। বছর কয়েক চাকা ঘুরতে পরিবর্তনও আসে খানিকটা। পরিবর্তিতরূপে প্রকাশ পায় আজকের ‘বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ’।

দুঃখজনক হলেও সত্যি, বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ সময়ের তুলনায় পিছিয়ে গেছে কয়েক যুগ। প্রাপ্তির খাতায় আছে ১০টি চলচ্চিত্র উৎসব, ৬টি প্রর্দশনী, ৩৫ মি.মি. এর তিনটি স্বল্পদৈর্ঘ্য ছবি, গুটিকয়েক গবেষণা এবং জার্নাল। তবে গত তিরিশ বছরে সবচেয়ে বড় অবদান আর্কাইভে সংরক্ষিত অসংখ্য চলচ্চিত্র। যদিও সেকেলে প্রযুক্তির সহায়তায় পুরনো প্রিন্টের ছবিগুলো বাঁচিয়ে রাখা এখন প্রায় একটি দুঃস্বপ্ন! ফলে নিয়মিত বিরতিতে নষ্ট হচ্ছে ফিল্মের পুরনো প্রিন্ট।

বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভের কিছু দুর্বলতা এবং বির্তকিত বিষয় তুলে ধরেছেন আর্কাইভের সাবেক মহাপরিচালক ড. মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর। তাঁর মতে ‘এ প্রতিষ্ঠানে যারা কাজ করেন তারা কারিগরিভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নন। এ কাজের জন্যে কারিগরি শিক্ষায় কেউই শিক্ষিত নয়... এছাড়াও নানান প্রতিবন্ধকতা আছে...’। তাঁর এই মতামত হয়তো সহায়তা করবে জাতীয় স্মৃতি ও ঐতিহ্য সংরক্ষণে, তবে কথাগুলো চোখের ঠুলি খুলে একদম আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়, আমাদের জাতীয় সম্পদ কতোটা অবহেলায়, বিনম্রতায় পড়ে আছে।

জাতীয় সম্প্রচার ভবনে সীমিত পরিসরে কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়া এই প্রতিষ্ঠানের আরও একটি মূল বাধা হলো-এর প্রবেশ পথ। কারণ পরিচিতির অভাবে সংগ্রহশালার কঠোর বেষ্টনী পেরুতে পারেন না চলচ্চিত্রে উৎসাহী বহু তরুণ। ফলে দুটো কাজ হচ্ছে, প্রথমত তরুণদের কাছে সময়ের ব্যবধানে অপরিচিত হয়ে উঠছে একটি ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান এবং দ্বিতীয়ত তথ্য উপাত্ত সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার, চলচ্চিত্র বিষয়ক সংগ্রহ, নানান দেশের দুঃষ্প্রাপ্য চলচ্চিত্রে জমছে ধুলার আস্তরণ। যা একই সঙ্গে তরুণ প্রজন্ম এবং আর্কাইভকে ঠেলে দিচ্ছে অনিশ্চিত একটি ভবিষ্যতের দিকে।

এতোকিছুর পরও আশার কথা হচ্ছে, বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভকে সম্পূর্ণরূপে ডিজিটাল আদলে নিয়ে আসার কাজটি চলছে। যদি লক্ষ্য পূরণ হয়, আর্কাইভ পরিণতি পাবে সময়ের মূর্ত ও প্রামাণ্য দলিলে। নতুবা আর্কাইভ এর ডিজিটাল রূপান্তরের বিষয়টি হয়ে উঠতে পারে একটি আধুনিক স্যাটায়ার।

▶ অনন্ত ইউসুফ

মুভি রিভিউ ।

মেড ইন বাংলাদেশঃ গর্ব নিয়ে দেশ গড়ার কথা বলে

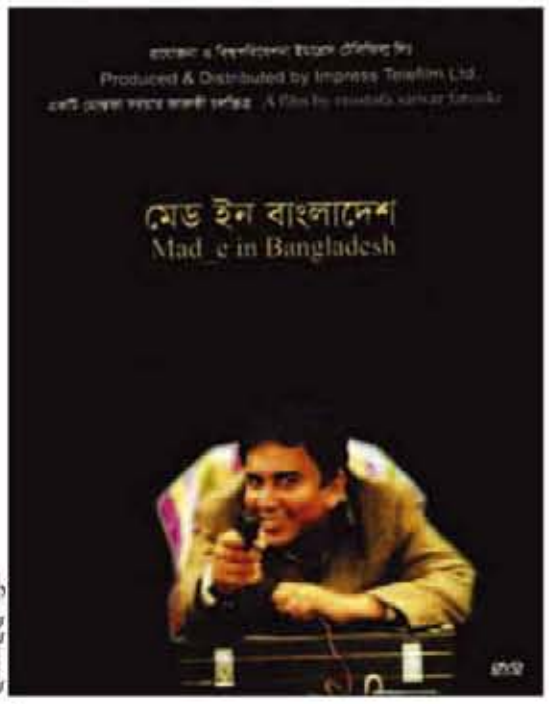

ইমপ্রেস টেলিফিল্ম প্রযোজিত ও মোস্তফা সরয়ার ফারুকী নির্মিত 'মেড ইন বাংলাদেশ' চলচ্চিত্রটি একজন বেকার ছেলের জীবনের টানাপোড়নের প্রতিচ্ছবি। আমি সত্যি এই ছবিটি দেখে অনেক বেশি মুগ্ধ হয়েছি।

প্রধান চরিত্র খোরশেদ আলম। চাকুরীর সন্ধানে মাত্র তিন'শ সত্তর টাকা নিয়ে রতনপুর থেকে ট্রেনে চড়ে ঢাকায় আসে। দিনের পর দিন চাকুরীর জন্য আবেদন পত্র জমা দিয়ে যায় । আর অপরিচিত শহরের প্রতিকূল পরিবেশে নিজেকে টিকিয়ে রাখার অক্লান্ত চেষ্টা করে চলে প্রতিনিয়ত। কিন্তু সাফল্য তার জীবনে যেন মরুভূমির মরীচিকা, কিছুতেই ধরা দেয় না। সমগ্র সমাজব্যবস্থা ও জীবনের অপ্রাপ্তির ক্ষোভ খোরশেদকে পরিচালিত করে এক ভিন্নমাত্রার বিদ্রোহের পথে। যার পেছনে ছিল তার মহৎ উদ্দেশ্য ও কিছু দাবি। তার দাবি ছিল ৮টি। এর মধ্যে একটি ছিল 'যে কোনও জনপ্রতিনিধিকে নির্বাচনে দাঁড়াবার আগে, একজন প্রার্থী হিসেবে তার সকল সম্পত্তি রাষ্ট্রকে দান করতে হবে। সন্ত্রাস নির্মূল, জনগণের সাথে সরকারী কর্মচারীর সদ্ব্যবহার এবং প্রতি শুক্রবার দেশের সকল নাগরিক এক টাকা করে রাষ্ট্রের কোষাগারে জমা দেবে এবং সেই টাকা দিয়ে বেকারত্ব দূরীকরণ ফান্ড করা হবে।

খোরশেদ ৮ জন গণ্যমান্য ব্যক্তিকে জিম্মি করে একটি পিস্তল এবং একটি বোমার সাহায্যে। ভয়ে অস্থির হয়ে পরে জিম্মি সবাই। বন্দুকের শক্তি যে কতো বড় শক্তি তা ভেবে খোরশেদের আত্মতৃপ্তি হয়। সে প্রমান করতে চেষ্টা করে 'অস্ত্রই সকল ক্ষমতার উৎস'।

দেশের উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের তোষামোদের চিরাচরিত রীতি এবং 'শক্তের ভক্ত নরমের যম' বিষয়টা খুব সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পায় এই চলচ্চিত্রে। পরস্পরকে কাঁদা ছোঁড়াছুড়ির রাজনৈতিক অবস্থাও ছবির একটি বিশেষ অর্থ প্রকাশ করেছে।

প্রশাসনের প্রত্যেকটা স্তরে কিভাবে অনিয়ম ছড়িয়ে আছে তা খুব সুন্দরভাবে ফুটে উঠতে থাকে সম্পূর্ণ ছবিতে। খোরশেদের পুরো কর্মকাণ্ডে ছিল পরিকল্পিত পাগলামির প্রকাশ। পাগলামির এক পর্যায়ে সে জিম্মিদের বাইরে বের করে জাতীয় সঙ্গীত গাইতে বলে। সে শুধু একটা কথাই বারবার বলতে থাকে 'আমি যা কিছু করেছি দেশের মঙ্গলের জন্য করেছি'। তার চাওয়া দেশে কোনও বেকার থাকবে না।

যখন সবাই জানতে পারল ভুয়া বোমা এবং নকল পিস্তল দেখিয়ে এই মানসিক বিকারগ্রস্থ লোকটি তাদেরকে জিম্মি করার এই অবৈধ উপায় বেছে নিয়েছে তখন সবার মনেই প্রশ্ন জাগলো যে কেন সে এমনটা করল?

তার শেষ পরিণতি অবশ্যই জেল। প্রধান চরিত্রটি, মানে খোরশেদ আলমের চরিত্রটি রূপায়ন করেছেন জাহিদ হাসান। সবকিছু মিলিয়ে একটি শিক্ষণীয় এবং মজার ছবি। অসাধারন কথাসাহিত্যিক আনিসুল হকের উপন্যাস থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে চলচ্চিত্রটি নির্মিত।

মফঃস্বলের একজন সাধারন ছেলে, যে তার শিক্ষিত হবার গৌরবে গর্বিত ছিল সর্বক্ষণ, সে যখন অনৈতিক কোনও কাজকে "একটি মহৎ" উদ্দেশ্য বলে দাবী করে, তখন শুধুই প্রশ্ন জাগে কেন নিজের গর্বিত অস্তিত্বকে বিলীন করে সে এমনটা করল? পুরো চলচ্চিত্রে এই প্রশ্নের উত্তর প্রত্যক্ষভাবে না দেওয়া থাকলেও, অন্তর্নিহিত অর্থটি স্পষ্ট প্রকাশ করে ঐ ছেলেটির গর্বকে কবর দেওয়ার কারণ। কারণ প্রতিনিয়ত এমন অনেক বেকার যুবক কবর দিচ্ছে তার স্বপ্ন, তার আকাঙ্ক্ষা । এইভাবে স্বপ্নের মৃত্যুর বিপক্ষে একটি আওয়াজ বলা যেতে পারে 'মেড ইন বাংলাদেশ' চলচ্চিত্রকে।

মদিনা জাহান রিমি

বুক রিভিউ ।

ঝরা পাতার গল্প

'সভ্যতাকে প্রশ্নের সম্মুখীন করার অধিকার ঈশ্বর হয়তো আমাদের নারীদের দেননি। এতে আমার কোন কষ্ট নাই। আমার কষ্ট সেখানেই- পুরুষের পাশাপাশি তিনি এই ধারায় নারীকে স্বতন্ত্র্য অস্তিত্ব দিয়ে পাঠিয়েছেন ঠিকই, কিন্তু অস্তিত্ব প্রকাশের চাবিটা দিয়ে রেখেছেন পুরুষের হাতে'।

উপরের কঠিন কথাগুলোকে খুব সুন্দর করে উপন্যাসে রূপ দিয়েছেন বিকাশ চন্দ্র ভৌমিক তার লেখা প্রথম উপন্যাস 'ঝরা পাতার গল্প' তে। একে শুধু মাত্র গতবাধা রূপক উপন্যাস হিসেবে বলা যাবে না। এখানে আমাদের সমাজব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে খুব রোমান্টিকভাবে দুজন প্রেমিক প্রেমিকার জীবনের বিভিন্ন অবস্থার মাধ্যমে তুলে ধরেছেন লেখক। পাশাপাশি এই উপন্যাসে একজন ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে সমাজের বিভিন্ন সমস্যা- অশিক্ষা, কুশিক্ষা, নারীর প্রতি অবহেলা, বঞ্চনা, লিঙ্গবৈষম্য ইত্যাদি তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

প্রবাসী স্বামীর অপেক্ষায় একজন নারীর একাকীত্ব থেকে শুরু করে নানা অনাকাঙ্খিত ঘটনায় নিজেকে জড়িয়ে ফেলা এবং অবশেষে তার মুক্তিসহ পারিপার্শ্বিক জটিল সামাজিক সমস্যা উঠে এসেছে লেখকের এই উপন্যাসে ।

অনেক বড় একটা অংশ জুড়ে রয়েছে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ। যেখানে প্রাধান্য পেয়েছে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর বর্বরতার ইতিহাস।

উপন্যাসের প্রধান চরিত্র জয়দীপ আর লাবণ্য। ছোটকাল থেকেই জয়দীপের ব্যতিক্রম ব্যক্তিত্ব ধরা পরে অন্যদের চোখে। যে বয়সে শুধু নিজেকে নিয়ে ভাবনার কথা, সে বয়সে সে জড়িয়ে পরে সমাজের ভালো মন্দে।

জয়দীপের একাকী জীবনে বাড়ির অদূরে কালের সাক্ষী হয়ে দাড়িয়ে থাকা শতবর্ষ বয়সী বটবৃক্ষটি সঙ্গী হয়ে ওঠে। প্রায় প্রতিটি বিকেল কাটে সূর্যাস্ত দেখে।এমনি এক মুহূর্তে একদিন জয়দীপ যখন পশ্চিম আকাশে সূর্যের করুণ মৃত্যু দৃশ্য অবলোকন করছিল, সেইক্ষণে অনেকগুলো বছর পর পাশে এসে বসে লাবন্য। গল্পের শুরু সেখানেই...

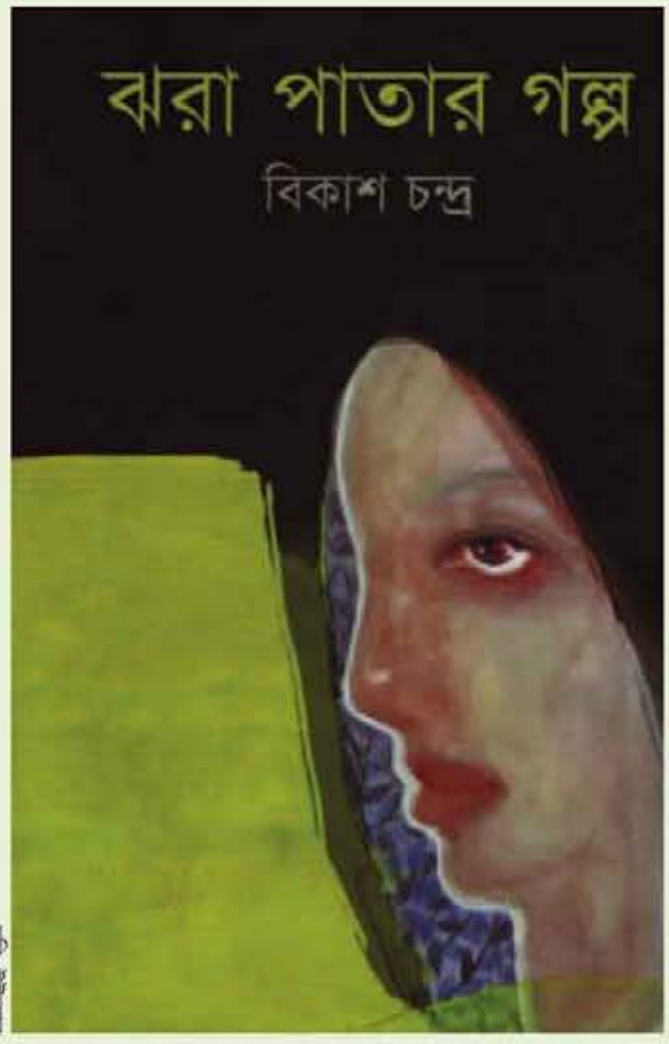

সিওল আহমেদ

ছবিঃ ইউল্যাব

টিম ইউল্যাব

ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস বাংলাদেশ (ইউল্যাব) এর উদ্যোগে গত ৪ থেকে ১৪ই ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত এগারো দিনব্যাপী মোহাম্মদপুর রামচন্দ্রপুরে ইউল্যাব-এর নিজস্ব মাঠে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল ৫ম ইউল্যাব ফেয়ার প্লে-কাপ ইন্টার প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি ক্রিকেট টুর্নামেন্ট ২০১২।

এই টুর্নামেন্টে ইউল্যাব সহ মোট আটটি দল অংশগ্রহণ করে। টুর্নামেন্টের খেলাগুলো ছিল টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটের। বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের প্রধান নির্বাচক ও সাবেক অধিনায়ক আকরাম খান উদ্বোধক হিসেবে এই টুর্নামেন্টের পর্দা উন্মোচন করার মাধ্যমে অংশগ্রহণকারী দলগুলোর মধ্যে শুরু হয় ক্রিকেটে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের লড়াই। কিন্তু, চরম প্রতিদ্বন্দিতা ও নাটকীয়তায় পরিপূর্ণ ম্যাচগুলো দেখে আঁচ করা যাচ্ছিল- কাজটি মোটেই সহজ নয়। মুহূর্তের অঘটনে পাল্টে যাচ্ছিল এক একটি ম্যাচের ফলাফল আর ক্রিকেটপ্রেমী দর্শকরা উপভোগ করছিলেন টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটের আসল স্বাদ। অবশেষে সকল জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে ফাইনালের টিকিট নিশ্চিত করে স্বাগতিক ইউল্যাব এবং স্ট্যামফোর্ড ইউনিভার্সিটি।

টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেয় স্ট্যামফোর্ড ইউনিভার্সিটি। কিন্তু শুরুতেই ইউল্যাব ক্রিকেট দলের বোলারদের তোপের মুখে পড়ে তারা। অসাধারণ বোলিংয়ের পাশাপশি আক্রমণাত্মক ফিল্ডিংয়ের কারণে নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারাতে থাকে স্ট্যামফোর্ড। অবশেষে ১৪.১ ওভারের সব উইকেট হারিয়ে সংগ্রহ করে ৮৮ রান।

নির্ধারিত ২০ ওভারে জয়ের জন্য ৮৯ রানের লক্ষ্য নিয়ে ব্যাট করতে নামে ইউল্যাব। দুই ওপেনার ব্যাটসম্যান হাসান ও জেসির শুভ সূচনাতে ইউল্যাব ক্রিকেট দল এগিয়ে যেতে থাকে লক্ষ্যমাত্রার দিকে। তবে খুব একটা মসৃণ ছিল না ইউল্যাবের ব্যাটসম্যানদের চলার পথ। স্ট্যামফোর্ড ক্রিকেট দলের বোলারদের বোলিংয়ের দাপটে একে একে হারিয়ে বসে চারটি উইকেট। সমর্থকদের মনে জন্ম নেয় সংশয় ও উৎকণ্ঠা। এত কাছে এসেও স্বপ্ন কি অধরাই থেকে যাবে! চ্যাম্পিয়ন ট্রফিটা কি নিজেদের হবে না! দ্বিতীয় ইনিংসে এই উৎকণ্ঠা আর সংশয়ের দোলাচালে যখন দুলছে পুরো ইউল্যাব, তখন ইউল্যাবের কো-কারিকুলার এ্যাকটিভিটিজ- এর তৎকালীন কো-অর্ডিনেটর রিয়াহিন ফারজানা করে বসলেন দারুন এক কাণ্ড। ব্যাটসম্যানদের উৎসাহ যোগাতে মাঠের বাইরে তাৎক্ষণিকভাবে কিছু সুশ্রী, তরুণী শিক্ষার্থী নিয়ে তিনি তৈরী করে ফেললেন চিয়ার লীডার টিম। চিয়ারলীডাররা ব্যাটসম্যানদের উৎসাহ দিতে লাগল। তাদেরকে নিরাশ করেনি ইউল্যাবের যোগ্য ছেলেরা, জবাব দিয়েছে চার আর ছক্কার সাথে সাথে। অবশেষে ১৭ তম ওভারের তৃতীয় বলে আনামের ব্যাট থেকে বাউন্ডারির মাধ্যমে যখন জয় সূচক রানটি এলো, তখন মুহূর্তেই পুরো খেলার মাঠ পরিণত হল ইউল্যাবিয়ানদের আনন্দ মেলায়।

ফাইনাল ম্যাচে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের সাবেক খেলোয়াড় হাসিবুল হোসেন শান্ত। এছাড়া বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইউল্যাবের ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য কাজী নাবিল আহমেদ এবং কাজী ইনাম আহমেদ। পুরস্কার বিতরণী প্যানেলে আরও যোগ দেন ইউল্যাবের উপাচার্য প্রফেসর ইমরান রহমান ও জুডিথা ও'ম্যাকার। ইউল্যাব শিবিরে তখন চ্যাম্পিয়ান ট্রফিটা ঘরে তোলার আনন্দ। আস্তে আস্তে দিনের আলো শেষ হয়ে আসছে। ইউল্যাবিয়ানরা তখন বাড়ি ফিরতে শুরু করল একরাশ ভালোলাগা নিয়ে।

কাগজে-কলমে 'টিম ইউল্যাব'-এর বিজয়গাঁথার গল্প এত সহজে লিখে ফেলা সম্ভব হলেও সহজ ছিল না 'টিম ইউল্যাব' এর সদস্য পঙ্কজ, জুয়েল, মাশকুর, আদনান ও তন্ময়দের জন্য চ্যাম্পিয়ান হবার পথটা। নিবিড় অনুশীলন ও কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে তাদের ধরে রাখতে হয়েছে জয়ের ধারাবাহিকতা। ঠিক কেমন ছিল আনাম, জয়, সাগর, তানভীর আর তানভীর জুনিয়রদের সেই পথচলা? ভালো খেলার সাথে সাথে তাদের মনে কাজ করত প্রচণ্ড মানসিক চাপ। আর ফাইনাল ম্যাচের আগে ইউল্যাব-এর প্রতিটি শিক্ষার্থী, ফ্যাকাল্টি মেম্বার আর স্টাফদের মনের একান্ত চাওয়াটা পূরণের অদম্য ইচ্ছা সেই অস্থিরতাকে বাড়িয়ে দিয়েছিল কয়েকগুন বেশী। শুধু ফাইনাল ম্যাচ বাদে বাকি সবগুলো ম্যাচে দলকে নেতৃত্ব দেওয়া আসিফ এ সম্বন্ধে বলেন, "শুধু আমরাই জানি, কতোটা মানসিক চাপের মুখে ছিলাম। তবে বিশ্বাস ছিল, মানসিক চাপ সামলে আমরা যদি নিজেদের সেরাটি দিতে পারি, তাহলে আমরাই চ্যাম্পিয়ান হব, হয়েছেও তাই।"

ইউল্যাব ক্রিকেট দলের কোচের দায়িত্বে ছিলেন অভিজ্ঞ ক্রিকেট কোচ শেখ মামুন। দল তত্ত্বাবধানের গুরুদায়িত্ব পালনের মূল নায়ক ছিলেন তিনি। খেলার পরিকল্পনা থেকে শুরু করে টিম মিটিং সকল ক্ষেত্রে কোচ মামুনের ভূমিকা ছিল অসাধারণ।তাই খেলোয়ারদের মুখেও শোনা গেল কোচের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা। ২১৫ রান করে ব্যাটসম্যান অব দি টুর্নামেন্ট নির্বাচিত হওয়া ইউল্যাব-এর হাসান কোচ সম্পর্কে বললেন, "স্যার আমাদের ব্যাটিংয়ের ব্যাপারে খুবই যত্নবান ছিলেন। দলের জয়ের সম্ভাবনার একটা বড় অংশ যেহেতু ব্যাটসম্যানদের উপরে নির্ভর করে, তাই তিনি আমাদের বেশ খানিকটা সময় নিয়েই ব্যাটিং অনুশীলন করাতেন।" বোলিং নিয়েও কোচের ছিল সমান পরিকল্পনা। বোলারদের নিয়ে প্রায়ই বিভিন্ন পরীক্ষানিরীক্ষা করতেন। আসিফ আরও জানালেন, "প্রতিটা ম্যাচের আগে টিম মিটিংয়ে আমরা প্রতিপক্ষ দলকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতাম। কোনও প্রতিপক্ষ অপেক্ষাকৃত দুর্বল হলেও আমরা সেই দলের শক্তিশালী দিকগুলো নিয়ে বেশি ভাবতাম। খেলার পরিকল্পনা করার সময় প্রতিপক্ষের প্রতিটি খেলোয়াড়কেই আলাদাভাবে বিশ্লেষণ করে, সেই ভিত্তিতে ছক কষতাম আমরা।"

৫ম ইউল্যাব ফেয়ার প্লে-কাপ ইন্টার প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি ক্রিকেট টুর্নামেন্ট ২০১২ টুর্নামেন্টের মিডিয়া পার্টনার ছিল কালের কণ্ঠ, সময় মিডিয়া লিমিটেড এবং রেডিও ফুর্তি। আর টুর্নামেন্টের ফ্যাশন পার্টনার ছিল ডোরস।

৫ম ইউল্যাব ফেয়ার প্লে-কাপ ইন্টার প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি ক্রিকেট টুর্নামেন্ট ২০১২-তে অংশগ্রহণকারী দলসমূহ হল- নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি, ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি, ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি, ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, স্টেট ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ, স্ট্যামফোর্ড ইউনিভার্সিটি, মানারাত ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি এবং ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস বাংলাদেশ।

আবদুল্লাহ্ আল্-রাফি সরোজ

তাহসান খান
উপদেষ্টা
ইউল্যাব স্পোর্টস ক্লাব

ইউল্যাব ফেয়ার প্লে-কাপ ইন্টার প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি ক্রিকেট টুর্নামেন্ট নিঃসন্দেহে বাংলাদেশের বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে একটি শীর্ষস্থানীয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতা। গত পাঁচ বছর ধরে আমরা এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করে আসছি। এবারে অংশগ্রহণকারী দল মোট আটটি, কিন্তু শুধু ঢাকাতেই বর্তমানে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা প্রায় পঞ্চাশটি। অসুবিধা হল অনেক বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব ক্রিকেট দল নেই। আবার অনেকের থাকলেও তারা তাদের ক্যাম্পাসের বাইরে দল পাঠাতে চাননা। তবে আমরা চেষ্টা করে যাচ্ছি, ভবিষ্যতে সবগুলো বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়কে নিয়ে এই প্রতিযোগিতা আরও বড় পরিসরে আয়োজন করার।

জাভেদ ইবনে হোসেন
সদস্য
টুর্নামেন্ট অপারেশন্স কমিটি

৫ম ইউল্যাব ফেয়ার প্লে-কাপ ইন্টার প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি ক্রিকেট টুর্নামেন্টে ইউল্যাব চ্যাম্পিয়ান হওয়ার অনুভূতি সত্যিই খুব আনন্দের। তবে টুর্নামেন্ট অপারেশন্স কমিটির একজন সদস্য হিসেবে আমার প্রধান দায়িত্ব ছিল সকল ম্যাচ নিরপেক্ষভাবে পরিচালনা করে সফলভাবে টুর্নামেন্টটি সম্পন্ন করা। পেশাদারী মনোভাব নিয়ে নিজের দায়িত্ব পালন করার সময় আমার নিজের দল ইউল্যাবকে সমর্থন জানানোর কোন সুযোগ ছিল না। কিন্তু, মনে মনে খুব করে চাইতাম, আমাদের ইউল্যাব চ্যাম্পিয়ান হোক। বাইরের নিরপেক্ষ সত্ত্বা আর ভেতরের আমির এই দ্বন্দ টুর্নামেন্ট চলাকালীন সময়গুলোতে খুব উপভোগ করতাম।

ছবি: ইউল্যাব

কথোপকথন

লেঃ কর্নেল মোঃ ফয়জুল ইসলাম (অবঃ), সেনাবাহিনীতে দুই যুগের বর্ণাঢ্য দায়িত্ব পালন শেষে ২০১২ সালে ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস বাংলাদেশ (ইউল্যাব)-এর রেজিস্ট্রার হিসেবে যোগদান করেন। ইউল্যাব ও নতুন কর্মক্ষেত্র প্রসঙ্গে তাঁর অনুভূতির কথা জানাচ্ছে ফারহান হাবীব।

ইউল্যাবিয়ান: আপনার কর্মজীবন শুরুর গল্পটা যদি আমাদের বলতেন?
রেজিস্ট্রার: আমি ১৯৮৭ সালে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে কমিশন লাভ করি। ১৯৮৭ থেকে সেনাবাহিনীতে দায়িত্ব পালন শেষে ২০১১ সালের জুলাই মাসে অবসর নেই।

ইউল্যাবিয়ান: সেনাবাহিনী থেকে অবসর গ্রহনের পর শিক্ষা কার্যক্রমের সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত করার কারণ কি?
রেজিস্ট্রার: সেনাবাহিনীতে দায়িত্বরত অবস্থায় আমি পাবনা এবং রাজশাহী ক্যাডেট কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে দীর্ঘদিন কাজ করি। সেখান থেকেই আমি অনুপ্রেরণা পাই শিক্ষা সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমের সাথে নিজেকে যুক্ত করার। তাই অবসর গ্রহনের পর অন্য কোনও ক্ষেত্রকে বেছে না নিয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকেই বেছে নিয়েছি।

ইউল্যাবিয়ান: ইউল্যাবে যোগদানের পর আপনার কি মনে হয়েছে এর নিয়মনীতি একটি বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার জন্য যথেষ্ট?
রেজিস্ট্রার: ইউল্যাব খুব বেশি পুরোনো বিশ্ববিদ্যালয় না হলেও এর নিয়ম কানুন যথেষ্ট ভাল। তবে সময়ের সাথে সাথে কিছু কিছু বিষয়ে পরিবর্তনতো আনতেই হবে। তবে তা হবে অবশ্যই শিক্ষা সম্পুরক।

ইউল্যাবিয়ান: প্রতিযোগিতার এসময়ে ইউল্যাবকে সামনের দিকে এগিয়ে নিতে কি কি পরিকল্পনা হাতে নিয়েছেন?
রেজিস্ট্রার: একাডেমিক কার্যক্রমকে আরও এগিয়ে নেয়ার জন্য আমাদের কাজের গতি বাড়ানোর ব্যবস্থা গ্রহন করছি। যাতে একজন শিক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত সেবা খুব সহজেই পেতে পারে। শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা সম্পুরক কার্যক্রম বৃদ্ধি, ক্যান্টিনের খাবারের মান উন্নয়নসহ বেশ কিছু কার্যক্রম গ্রহন করা হয়েছে। আমরা এরই মধ্যে মেয়েদের কমনরুম, ইনডোর গেম এবং ক্যাম্পাস 'এ' এর ক্যান্টিনের মত ক্যাম্পাস 'বি' এর ক্যান্টিনেরও আধুনিকায়নের সিদ্ধান্ত গ্রহন করেছি।

ইউল্যাবিয়ান: ইউল্যাবিয়ান নিয়ে আপনার মতামত কি?
রেজিস্ট্রার: 'ইউল্যাবিয়ান' অবশ্যই একটি ভালো উদ্যোগ। যেহেতু মিডিয়া স্টাডিজ এবং জার্নালিজম নামে আমাদের একটি আলাদা ডিপার্টমেন্ট আছে তাই 'ইউল্যাবিয়ান' অবশ্যই এই বিভাগের শিক্ষার্থীদের হাতে কলমে সাংবাদিকতা শেখার সুযোগ করে দেবে। শুধু তাই নয়, 'ইউল্যাবিয়ান' আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে ইউল্যাবের মুখপাত্র হয়ে বিশাল ভূমিকা পালন করবে।
ইউল্যাবিয়ান: ধন্যবাদ।
রেজিস্ট্রার: ধন্যবাদ।

ভ্রমণ । **ঘরে বাইরে ঘুরোঘুরি**

ছবি: ইউল্যাব

ভ্রমণ মানে নতুনকে জানার এক অপার আনন্দ। আর সেই আবিস্কারের স্বাদ নিতে প্রতিবছর ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস বাংলাদেশ (ইউল্যাব) এর একঝাঁক তরুণ তরুণী ছুটে যায় বাংলাদেশের নানা প্রান্তে। বান্দরবানের তিন্দু ও তাজিংডং, বিড়িসিড়ি, সুন্দরবন ঘুরে ইউল্যাবের অ্যাডভেঞ্চার প্রেমীরা ২০১২ সালের জন্য বেছে নেয় বাংলাদেশের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ চূড়া কেওক্রাডং। ইউল্যাব অ্যাডভেঞ্চার ক্লাব তাদের যাত্রা শুরু করে ২৩ মার্চ। কেওক্রাডং ভ্রমনের মূল লক্ষ্য ছিল আগের ভ্রমনগুলো থেকে একদম আলাদা। পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী পাহাড়ে ভ্রমনপথে ইউল্যাব এর শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা বেশ কিছু সমাজসেবামূলক কাজ করেছে। যার মধ্যে ছিল বৃক্ষরোপন, স্বাস্থ্য সচেতনতা বিষয়ক প্রচারনা, অপচনশীল ময়লা-আর্বজনা পরিষ্কার করা। এছাড়াও স্থানীয় লোকজনের মধ্যে দাঁতের যত্ন সর্ম্পকে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য প্রচারণা চালিয়েছে ইউল্যাবের অ্যাডভেঞ্চার ক্লাব। সেইসাথে উপহার হিসেবে প্রতিটি আদিবাসি পরিবারকে দিয়েছে একটি টুথপেস্ট ও দুটি করে ব্রাশ। এছাড়াও বগালেকসহ বান্দরবান উপজেলার বিভিন্ন স্থানে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি চালিয়েছে অ্যাডভেঞ্চার প্রেমীরা। এবার তো ঘোরা হল কেওক্রাডং, তারপরও বান্দরবান ঘোরা যেন 'শেষ হইয়াও হইল না শেষ', তাই ভ্রমণ পিয়াসু অ্যাডভেঞ্চার ক্লাবের পরবর্তী গন্তব্য আবারো পাহাড়ের রাণী বান্দরবান।

ফারজানা সুলতানা